তৈন্গাঙ

Toingang

তৈন্‌গাঙ

বৈসু-সাংগ্রাই-সাংগ্রেং-বিষু-বিজু-বিহু (বৈসাবি) সংখ্যা-২০০৯

Toingang

The Baishabi Publication-2009
On the greatest Social Festival of the Indigenous Peoples in
Chittagong Hill Tracts

সম্পাদক

Editor

অমিত তঞ্চঙ্গ্যা

Amit Tangchangya

প্রকাশনায়

তৈন্‌গাঙ লিটারেচার ফোরাম, ঢাকা, বাংলাদেশ

Published by

Toingang Literature Forum, Dhaka, Bangladesh

Scanned with CamScanner

তৈন্‌গাঙ

৫ম সংখ্যা
প্রকাশকাল : বৈসাবি সংখ্যা, ১৪ এপ্রিল, ২০০৯ইং,
১লা বৈশাখ-১৪১৬ বাংলা

বিশেষ সহযোগিতায়
মৃণালকান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, জ্যোতি বিকাশ তন্‌চংগ্যা, অছ্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

প্রচ্ছদ
মিঠুন কুমার সাহা
চারুকলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (০১৭১৮৫৫৫৩৪৮)

গ্রাফিক্স এবং কম্পিউটার কম্পোজ
আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা

মুদ্রণ
চট্টলা প্রিন্টার্স
কাটাবন, বিশ্ববিদল্যালয় মার্কেট, ঢাকা। (০১৯১২৬৭০৫৯০)

কৃতজ্ঞতায়ঃ
জ্ঞানরঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা,
প্রধান শিক্ষক, বান্দরবান সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও
জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

মূল্যঃ ৪০ টাকা; শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা

যোগাযোগঃ ৪৬৫-জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।
Contact: 465 Jagannath Hall, University of Dhaka,
Dhaka-1000, Bangladesh.
E-mail: toin_gang@yahoo.com, achya_tang@yahoo.com

উৎসর্গ

প্রয়াত শ্রী অনিল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা
বিশিষ্ট সংস্কৃতিকর্মী, শিক্ষক, ক্রীড়ানুরাগী ও
বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক
জাতির উৎকর্ষে যিনি ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ
তৈন্‌গাঙ লিটারেচার ফোরাম তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবারের
তৈন্‌গাঙ বৈসাবি সংখ্যা তাঁর স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করা হল।

তৈন্‌গাঙ
৪৬৫-জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

সূচী

কবিতা

সম্পাদকীয়

এসো জাতির উন্নয়নে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একত্রিত হই;

"তৈন্-গাঙ" বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য এলাকার একটি ছোট নদীর নাম। নামটি অতি সাধারণ অর্থ হলেও এর আদলে লুকিয়ে আছে একটি জাতির উত্থান। এটা বিবেচিত হয় যে তৈন্-গাঙ এর তীরে তঞ্চঙ্গ্যারা প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। পর্যায়ক্রমে এখান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় তঞ্চঙ্গ্যারা বসতি স্থাপন করে।

জাতিসংঘের পরিসংখ্যান মতে, বিশ্বের ৭০টির অধিক দেশে ৫,০০০ পৃথক পৃথক জন জাতির প্রায় ৩০ কোটির অধিক আদিবাসীর বসবাস। আর পৃথিবীর দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশে ৪৫ টি পৃথক পৃথক জন গোষ্ঠীর প্রায় ২৪ লক্ষেরও অধিক আদিবাসী বসবাস করছে। তার মধ্যে ১৪টি জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮ লক্ষের অধিক আদিবাসীর বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রামে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের পর থেকে সমগ্র বিশ্বের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা "বৈসাবি" পালন করে আসছে। বাঙ্গালীদের নববর্ষ পালনের পাশাপাশি আদিবাসীদের "বৈসাবি" এদেশকে যেভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে তার চেয়েও বেশি করেছে সমৃদ্ধ। এদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৪টি জাতি সত্ত্বার (তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, খিয়াং, লুসাই, পাংখো, বম, ম্রো, আসাম, গোর্খা, চাক, রাখাইন, খুচি) বৈসাবি পালিত হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আর এর মধ্যে ফুটে উঠে প্রত্যেকটি জাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনধারা। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীও আবহমান কাল ধরে "বৈসাবি" পালন করে আসছে। পুরানো বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে ডাক দিয়ে নিজস্ব নামে "বিষু" তাদের জীবনে নেমে আসে নতুন কিছু প্রত্যাশা নিয়ে। বিষু তাদের কাছে আনন্দের শব্দ ভালবাসার শব্দ। কারণ "বিষুর" সাথে জড়িয়ে আছে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সংস্কৃতি, জীবন ধারা, সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না। তাইতো বিষু আসার সাথে সাথে তঞ্চঙ্গ্যা তরুণ-তরুণীরা আনন্দের সাথে গেয়ে উঠে ....

"বিষু পাইস্যায়া দগেত্তে
পআনান কুসালী গত্রত্তে
দেখং শুক তারা জাগিলে
স্ববনত দেগং ঘুম গেলে"
অর্থাৎ .....
বিষু পাখিটা ডাকছে
প্রাণ চট্‌পট্‌ করছে
দেখি শুকতারা জাগলে
স্বপ্ন দেখি ঘুমের ঘোরে।

২০০৫ সালে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে পথ চলা আরম্ভ করে তৈন্‌গাঙ লিটারেচার ফোরামের লিটল ম্যাগাজিন "তৈন্‌গাঙ"। এদেশের ৪৫টি আদিবাসীর গোষ্ঠীর সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, জীবন ধারা বৃহৎ বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি আমরা

বিদেশেও পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। "তৈন্‌গাঙ" ম্যাগাজিন্‌টি ২০০৫ সালে যাত্রা শুরু করে ৯ আগষ্ট জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে। এটি মূলত আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে হলেও তৈন্‌গাঙের পাঠকদের ব্যাপক অনুরোধের ফলে ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয় "তৈন্‌গাঙের বৈসাবি" সংখ্যা এর ধারাবাহিকতায় তৈন্‌গাঙ লিটারেচার ফোরামের "তৈন্‌গাঙ" প্রকাশনাটি বৈসাবি-২০০৯ উপলক্ষে প্রকাশ করা হয়।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র সৃষ্টি "তৈন্‌গাঙ" আশাকরি গুণীজন মহলে এবং পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। আর পাঠকদের সৃজনশীল মনকে যদি "তৈন্‌গাঙ" ম্যাগাজিনটি সামান্যতম দোলা দেয় তাহলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। যারা আমাদের লেখা পাঠিয়েছেন, মতামত, পরামর্শ, মূল্যবান সময়, বিজ্ঞাপন, আর্থিক সহযোগিতা করেছেন এবং বিশেষকরে মৃনাল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, জ্যোতি বিকাশ তন্‌চংগ্যা, অচ্ছ্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা অনেকের লেখা ছাপাতে পরিনি, তাদের কাছে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। তৈন্‌গাঙ লিটারেচার ফোরাম সৃজনশীল নবীন লেখকদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে তাই আপনারা আরও সৃজনশীল লেখা পাঠিয়ে আমাদের ধন্য করবেন। মানুষের ভুলভ্রান্তি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু নয়। আর যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তাহলে আশা করি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সর্বশেষে সবাইকে তৈন্‌গাঙ লিটারেচার ফোরামের পক্ষ থেকে বৈষু, সাংগ্রাই, সাংগ্রেং, বিষু, বিজু, বিহু (বৈসাবি)-র শুভেচ্ছা ও অভিন্দনন।

অমিত তঞ্চঙ্গ্যা
সম্পাদক
বিষু (বৈসাবি)– ২০০৯

The Tangchangya and their Bishu Festival

-Achya Kumar Tangchangya

Prologue

The Chittagong Hill Tracts (CHT), including three hill districts Rangamati, Khagrachary and Bandarban is very significant region which situated south eastern part of Bangladesh. It's significant especially for the two reasons. One is for its geographical views and another is for living the many ethnic groups who are dueling with their multi dimensional cultural life pattern from the ancient time. These hill tracts are found at various attitudes with breath taking fountains, forests and jungles, lakes, rivers, canals, inadequate plain lands which are full of natural beauties and charming land scrapes that appear with different types of pleasant scenery. With these features here dueling ethnic communities and their unique cultures are very notion able.

The ethnic groups having started to live in this region are known as: the Chakma, the Marma, the Tripura, the Tangchangya/Tanchangya, the Mru (Murang), the Rhakhain, the Bawm, the Pankhua, the Lusai, the Khumi, the Chak, the Khyang and later added the Asam and the Gurkha. It can be say doubtlessly that every of these groups have their own culture and life style.

The Tangchangya

The Tangchangya is a colorful ethnic group among the more than 45 in Bangladesh who are mainly dueling at Bandarban, Rangamati in Chittagong Hill Tracts (CHT), Raujan in Chittagong and at the costal and hill sides of the Teqnaf in Cox Bazar districts. Beyond of the country they are living at several states (Mijuram, Tripura, Arunachal, Monipur etc.) in India and major spread in Myanmar. But who are in Myanmar they have been known as the different name from the ancient time as the Dainak.

There are quite a few debates that how has comes the word Tangchangya. Some of them think that it came from "Tang". In the Marma's (now an ethnic community in Bangladesh) word the "Tang" means hill because they had lived on the hill. Long ago they were nearer with this community so it may be their called word. Other argues is that most of the Tangchangya have a separate house which is attached with the main

house. It is said "Tong Ghar". This Tang Ghar is for the living to the guests. No other communities have such homestead. So this is very special. And most of the people think that, the word Tangchangyas "Tang" has comes from their guest home "Tang Ghar". Another argues is that when they had come from Arakan in Myanmar, firstly they made their dueling besides the Toingang's valley (now in the middle side of Bandarban and Cox Bazar's District in Bangladesh), so the other communities' peoples especially the Chakma and the local Bengalese peoples had been called them "Toingangya" which means who live in Toingang. The first English Deputy Commissioner in CHT's Captain Luin (1869) has used the "Tangchangya"s spelling as "Toungiynya".

Anyway, whatever the causes the fact is now they are well known both of the Tangchangya or Tanchangya in Bangladesh and India which is same originally. And only word's differences who are living in Myanmer because from the primeval time they known as the Dainak named. The Dainak is an Arakanian word which means Warrior.

According to the government census in 1991 the total populations of ethnic groups of Bangladesh are 12, 05978 and hereby the Tangchangyas are 21,140. But that census report was not accepted to the Tangchangya community. Because there are argue of them is, most of the Tangchangya were behind of these count, as they lived at the remote areas and yet also and so that who had collected the data they didn't take accurately for not gone there. They were dependent on idea. Because it was difficult also for the lack of transport system and political violence's of CHT's at that times. It's said that, there was more than forty thousands Tangchangya population (40,000) in 1991 of the country. After that it has no accurate government census on the Tangchangyas yet. According to the president of "Bangladesh Tangchangya welfare Association" Mr. Prasanna Kanti Tanchangya, there are more than eighty thousand (80,000) in Bangladesh including the amount of come back from India after the CHT's Pease Treaty in 1997 and the Cox Bazar district areas most of them who wear counted as Chakma at that census.

It's said that one part of the Tangchangya with approximately four hundred (4,000) peoples had come in Chittagong's hills at the rules of the Chakma Raja (Chakma's Chief) Dorom Box Khan in 1819. The total group divided into 12 sub groups and a leader each. Mr. Paprue was the leader of the whole group. He prayed to Chakma Raja to live there.

But Mr. Raja didn't recognize him as the leader of the group and live there with their own cultural identity. So, most of them go back in Burma with Mr. Paprue. Some who stayed and later added with the same identity they are now known as Tanngchangya.

Racially The Tangchangyas are Mongoloid and Buddhist religion but some of them are do practice animism yet besides obeying the Buddhism mainly. Sir Rijli (1891:170) also detailed the Tangchangya are included on old Mongoloid on their face and body structure. But he wrote they are not totally in Buddhism. T.H Captain Luin detailed his book THE HILL TRACTS OF CHITTAGONG AND DUELLERS THERE IN (1869), "Though they are Buddhism but not free from animism. They have vague and undefined ideas of some Devine power which over as shadows all."

They spoke on own Tangchangya language which is included of Indo-Aryan language group. Dr. G.A Gierson, (a German researcher) proved it in 1903 at his book "Linguistic survey in India". There are slightly linguistic affinities between the Tangchangya and Chakma communities.

They play patrilineal, patriarchy and significantly patrilocal in the society system. They have twelve different clans and each clan have own lineal structure which they called "Gocha". But in Bangladesh there are only known seven Gocha. They are as bellows:

1. Dainnya Gocha
2. Mho Gocha
3. Karba Gocha
4. Monghla Gocha
5. Mhelong Gocha
6. Lhang Gocha
7. Aongya Gocha

The other five clans are in Burma now.

In Bangladesh the Tangchangya is a cultural diversity's group with having their own language, script, tradition, art, folk song and dance, knowledge, food habit, dress patter(five kinds of women's), custom, festival, belief and rituals, as well as cultural life style. In CHT's 14 ethnic communities the Tangchangya culture is very distinctive. The "Bishu" is their main social and cultural festival. They also celebrate other social, cultural, traditional and religious festivals. It's seen their cultural identity in every festival.

The Tangchangya's women are too much industrial. Besides helping the husband at outdoor and household activities, they weave traditional cloths and do handicraft activities in the free time. They are a great part of the family of their participation.

The Tanchangyas prime livelihood is shifting cultivation (Slash and burn) which is called "Jhum" in locally. They do hard work. In the leisure periods they gossip and visit among themselves and somehow arrange cultural function nearby. They are generally shyness and quietness and friendly in character. It can be said that the Tangchangya is a peaceful and culturally riches ethnic group in Bangladesh.

The Bishu Festival

Bishu is a name of festival which is much related with the Tangchangya community. Its every ritual is a symbol of their culture and livelihood. The Bishu is such as festival where nicely blooms their culture. It has been celebrating from the very olden time with own shaped. Though it is a very plain but cultural meaningful word in the Tangchangya community which contains total three days with rituals and festival, the last two days of leaving year's the Bengali month Chaitra, which first day is "Full (flower) Bishu" and the second is the "Mull (main) Bishu", and the next day which is called "Noa Basha" (New Year), that is the first day of the Bengalis New year.

These Bishu is mainly to farewell the aged year and on the other hand to welcome the New Year. It's a symbol of pleasure, place of meet and source of new stamina to the Tangcangyas. In this festival they celebrate some rituals which are explained in bellow:

(a)Full Bishu (Flower Bishu)

Full means flower in the Tangchangyas word. This is the starring and first day of Bishu. As most of the people become colorful by flower in this day so it is called Full Bishu. In this day the Tangchangyas decorate their house and worship to the "Gongama" (The mother of river) by various kind of flower. Especially there is a kind named "Bishu full" which bloom at this season. It has a special demand and motion in that case. In this day the family members get up early in the morning. Especially the elders say to the children that, "Bishu Gula (Bishu's fruit) is flowing on the river; get up early and let to catch it". Actually these Bishu Gula is a mythical fruit which has no existence in really. It is just a

technique to wake up the children in early morning hurriedly. The elders spread food to the domestic birds and cattle for their good eating and well-being and they go to one place to another place. They take it special care on it in the overall days so that all beings are been happy. They candle at the root of large tree and riverside. The day starts with pleasure and wholly goes joyfully.

(b) Mull Bishu (Main Bishu)

Mull means main in the Tangchanggyas word. The main and most of the rituals have celebrated in this day so it's called Mull Bishu. This is the last and farewell day of the year. They convey Good Bye this day by reminding the sorrows and pleasures of the year and expecting better for the next. They arrange many games as like the Nareing Khala (Top's game), Baitteng Khala(This game played between two persons on standing and walking with two bamboos, who fall from the bamboos he considered as defeated) in day, and especially in evening there plays very traditional game "Gila Khala" and traditional "Genguly Geet" (One kind of mythical songs performed by an expert customary singer). In the day they make many kinds of delicious food and pie in every home. They share these foods by visiting home to home. Some bodies that are able arrange feast and especially to the older with enhanced items. They drinks Bishu's "Doswani Mod", "Joga" and "Fuci" (these are own formed traditional wine). They have bath to the older for getting bless instantly because they think the older blessing is very sacred and it occurs truth. In this day they explore together with friends (it may be boy and girl, jointly or grouping) and share their talk and emotion. The night also goes very enjoyably.

(c) Noa Basha (New Year)

It's in the New Year day. They try to be honest, truthful and sanctified in this day and involve in sacred and welfare activities. They belief as this is the starting day of the year, so how the day will have go on, the whole year will be go on such. They think this day indicates the intact year. They practice a ritual in this day that is who had born in this day go to a tree which is same height of him/her and keep the neck at the middle of the branch's cross and pray that "go away all of my miserable and misfortune from now and come a good luck". This is called "Cibat basana" (to confine in trap) in their word. Overall they pass this day by doing good workings and in evening listened religious holy ethics from

the monk at the temple.

Thus the Tangchangya celebrate their Bishu festival. But somehow it may be something difference in term of locality and age set. In general they celebrate these as for gratification and expecting a better life.

The Bishu is the one great part of their culture where they can express their emotions, thinks, knowledge among themselves. They come to near these days to each other by celebrating the Bishu rituals. But in the earlier there are changing this rituals where can see somehow huge differences between the ancient and recent rituals. Instead of the aboriginal rituals, now is adding modern, and various cultural ideologies. So at the result is that, the Bishu rituals are not stagnant on its own places and changing it by the time and space. So therefore are growing up the complexity of culture. As like there is increasing the local and regional variance to realize the conception of Bishu, and which impacts go on their social and cultural life.

The others communities' festival of similar formed in CHT's

The other ethnic communities also celebrate somehow shaped this Bishu festival approximately at this time besides the Bengali New Year in CHT. They also celebrate from their own position with integration of the culture and tradition. These communities are: the Chakma, the Marma, the Tripura, the Chak, the Rakhain, the Asam, and the Gurkha. The Chakma say it Biju, the Marma is Sangrai, the Rakhain is Sangraing, the Tripura is Boishuk and the others are alike named as Tangchangyas Bishu. Among of them it has most tune relationship between the Bishu and Chakma's Biju. The Chakma celebrates the Goggeya Poggyea Biju by being huge drunkard. Overall have a correlation all of the others communities. The Marma's Sangrai and the Rakhain's Sangraing both are the similar, because the origin of the communities is same. Here have some differences, as like the Tangchangyas celebrated total three days but on the other hand somehow they celebrate it five or seven days which decision taken by both of the their society's leaders and the temple's Head Monk and always they start it one day later between the Tangchangyas. Here, their attractive and remarkable ritual is "Water Festival" held in the last day which is not present to the Tangchangyas. This festival held on between the two opposite genders, girls and boys. In this festival they select their likely lovers or bright and groom.

The Tripura celebrates their Boishuk by their tradition. "Goraiya Dance" is special in those days to them. The Chak community also celebrates this with their identity. They follow some Buddhism's rule besides the social practices. The Asam and Gurkha are Hinduism. They also celebrate it at the same name as Bishu and Hindu customs shaped.

The overall have huge similarities and dissimilarities between the Tangchangyas Bishu and other explained. The foremost similarity is that, to Good Bye the old year and welcomes the New Year and the dissimilarity is the style of the celebration of the rituals by their own ethnicity and culture. So there is no way to compare that which is better or worst. In jointly it says now "Boisabi" (Boishuk+Sangrai+Bishu+biju).

The Bishu is roofed with their Social Life

The Bishu's rituals are deeply embedded with the Tangchangyas social life. The symbols of the rituals are the expression of their social phenomenon. Its rises up from various social believes and ideologies. At the same time this rituals also inspire to their social life style. They get encouragement from the Bishu. If there is some lacking of relationship to the man to man, family to family, lineage to lineage or village to village, the Bishu helps to frame by creating a good bond among them. So their society becomes strong on ties by this. Because Bishu's another means is solidarity. Especially in this time they have no a sin or guilt to each other even they would have hostile relationship. Somehow they take the opportunity to come nearer at this time. Who have bad relationship with others they try to be flexible or another third person try to meet them. The couples or who have weakness to opposite gender they come near to nearest by expressing their secret talk. At last they fall in love and somehow which make to easier to married. Generally drinks is permitted at maintaining the situation and leveling, as like prohibited to take together to the son-father or uncle, upper-lower, rich-poor, senior-junior, male- female etc. relationship. But it becomes more flexible among this level in the Bishu. Somehow various social restrictions become inactive then. So the Bishu makes a great relationship in social life. Because, there is a tradition that nobody does quarrel to each other in this days and who does unfortunately they recognized as much despised person. This tradition helps them to be united later and they overcome many difficulties of their personal and social life. On account of visit door to

door for sharing invitation and joining to the cultural, social functions they introduce with each other and fill upped their gaps.

There are no mindfully differences to celebrate it between the poor and rich. Because the main aim are one and same. Only who are possessions at times they make a large arrangement by inviting guest. Somehow they contribute to accumulating social and cultural function as like the Nareng Khala (top game), Gila Khala (a game played along team with one kind of sacred wild's fruit) etc in night. After that the next morning they arrange a fest by a big swine. Overall they enjoy sharing the whole.

The Bishu's culture and tradition does rich to the social life as well as positively influenced upon the society. They forget their old rough memories and become fresh newly by trying to change their mind positively. Finally we can say that the Bishu diverts the Tangchangyas social life to movable and enhance to the new dimension and it does make the Bishu great also.

Wrapping up

In sum up, I would like to say that the Bishu is very unique and full of cultural sense to the Tangchangya community. Their total life is mixed here. The celebrated time is also at their leisure period. Because at this time they become free, as like there is no the Jhum cultivation (the season is also not suitable) and others, but as its being spring that comes nature's changes by more colorful so it's too much suitable with being workless that has been enjoyable and funny. So that, they usually want to aggregate their knowledge and thinks by share the enjoyments and pleasures.

But the changing process of their Bishu rituals by the time and space especially who are influencing by the urbanization and globalization are threatening their cultural origin. The lack of program and activities where such as aspect so that become impoverish the Bishu day by day.

But some of them are now being aware to keep going their antique traditions. I am very much delighted that they actually don't want to leave these traditional-ancestral rituals though facing various constrains. Now they are trying to realize that their life is implies in their culture. Its say to true that the socio-economic and cultural composition of their total social life is deeply related with those memorable Bishu rituals.

This writing is a short part of my studied Research Monograph on the Tangchangya and their Bishu rituals where I've used anthropological knowledge of participant observation and fieldwork. I would like to introduce to the readers on the Tangchangya community and their main festival "Bishu" shortly. At the same time I want to make an attention to this community to be alert to sustain and promoting their cultural origin and tradition. Most of the people don't know upon the Tangchangyas and their rich culture. Even the Tangchangyas also know very little on own ethnicity. Because there are no sufficient research and writing on them. So my in-depth objective of this expose is to lift up their cultural position in front of the peoples that they would be interested on them which been supported to promoting their culture besides the Tangchangyas.

Bibliography

Tangchangya, Achya Kumar (ed.) (3rd and 4th, 2008) Toingang: Toingang Literature Forum, Dhaka.

Debnath, Rupak, (2008), Ethnography study of Tanchangya of CHT, CADC, Sittwe and South Tripura: Kreativemind, kolkata.

Tanchangya, Mrinal Kanti (ed.) (2006) Toingang: Toingang Literature Forum, Dhaka.

Tanchangya, Jyoti Bikash (ed.) (2005) Toingang: Toingang Literature Forum, Dhaka.

Census Reports of 1991, 1994 B.B.S, Dhaka.

Tangchangya, Rati Kantha (2000), Tangchangya Jati: Rangamati

Tangchangya, Bira Kumar (ed.) (1995) Tangchangya Parichity: Bangladesh Tangchangya Kallyan Sangstha.

Census Reports of 1991, 1994 B.B.S, Dhaka.

EART TOUCH -An occasional magazine of SHED.

Shelly, Mizanur Rahman, (1992), the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The Untold Story, Dhaka: Center for Development Research, Bangladesh (CDRB)

Dewan, A.K (1990) Class and Ethnicity in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: PhD Dissertation, McGill University.

Bernard, H. R. (1988) Research Methods in Cultural Anthropology: Sage Publication Inc.

Hutchison, R.H.S (1906) an Account of Chittagong Hill Tracts, Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot.

*Student, Department of Anthropology, University of Dhaka.

E-mail: achya_tang@yahoo.com

বিষুর সেকাল একাল

শ্রী উচ্চত মনি তঞ্চঙ্গ্যা

সেকাল-সোনালী শৈশবে 'বিষু' ছিল বড় আনন্দের। নতুন জামা কাপড় প্রাপ্তি, সঙ্গী সাথী নিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে পিঠা, বিন্নিভাত, কাউন, পায়েশ ইত্যাদি খাওয়া আর চিত্বানন্দে খেলাধূলা করা। কিন্তু একালে অর্থাৎ বর্তমানে বিষু আমাদের অনেকের নিরানন্দে কাটে। বিষু মানে একটা বাড়তি খরচ। ছেলে মেয়েদের কাপড়-চোপড় থেকে শুরন্ন করে উৎসবের সব আয়োজন একটি বাড়তি খরচ বলেই মনে হয়। যারা চাকুরী করে তাদের তো ফ্রেষ্ঠিভাল বোনাস বা উৎসব ভাতা প্রাপ্তি আছে সুতরাং উৎসব উদ্‌যাপনে তাঁদের কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু আমার মত যারা উপার্জনহীন বেকার তাদের তো বিষু মানে মাথা ফোর্টি নাইন।

মনে পড়ে সেই সোনালী শৈশবের বিষুর কথা। প্রত্যুয়ে ভোরে উঠে বাগান থেকে ফুল ছিড়ে নদীতে স্নানাদি ছেড়ে নতুন জামা কাপড় পড়ে ফুল ভাসিয়ে দেয়া, ঘর থেকে ফুল দিয়ে সাজানো আর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে পিঠা পায়েশ খাওয়া। প্রথম দিবসকে ফুল বিষু বলা হয়। দ্বিতীয় দিন মূল বিষু, তৃতীয় দিন নোয়া বষ বা নববর্ষ। বাংলা পহেলা বৈশাখই এই নোয়া বষ। এই তিন দিন কাটতো মধুর আনন্দে। আনন্দে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে ছোট, যুবক-যুবতী, বিবাহিত ও প্রৌঢ় এ কয়েক স্হরে বিভক্ত ছিল। জৈষ্ঠ বিবহিতরা পিঠা পায়েশের চেয়ে মাদক সেবন করতো বেশী। তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি স্বরন্নপ প্রত্যেক ঘরে ঘরে মদ, জগড়া, কাইঙ্কি ইত্যাদি তৈরী করা হত। জৈষ্ঠরা দলবল নিয়ে তাল মাতাল হয়ে ঘুরতো। তাদের বাদ্য যন্ত্র ছিল থালা, গামলা, পাতিল, কলসী ইত্যাদি। মাতাল অবস্থায় পাঁচ মিশালী, দশ মিশালী গান, আর বিচিত্র ভঙ্গীতে নাচ। একজন হিন্দি গান ধরলো তো আরেকজন উর্দু কিংবা উভাগীত। প্রত্যেক ঘরের উঠানে এই নাচ গান চলতো। যতক্ষণ গৃহস্থ মদ, জগড়া, কাঞ্চি পরিবেশন করতো ততক্ষণ এই নাচ গান অব্যাহত থাকত। আমরা ছোটরা তাঁদের এই হেন আনন্দে জড়ো হয়ে শুধু হাসতাম আর হাততালি দিতাম। এক ঘর শেষ হলে আরেক ঘরে, এভাবে পাড়াময় ঘুরতো। যুবত-যুবতীরা গিলা খেলার আয়োজন করতো। জৈষ্ঠ মাতাল দলের সাথে যুবকদের বলি খেলাও চলতো। প্রৌঢ়রা নতুন সুব্র ধুতি পড়তো। মহিলারা তাদেরকে অন্ন, পিঠা, পায়েশ দান করে আর্শীবাদ নিতো। নোয়া বষ বা নববর্ষ দিনে গৃহস্থরা কুরন্নম (বাঁশের বেতে তৈরী ছোট ঝুড়ি) এ ধান ভরে প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে ধান ছিটাতো। যুবক যুবতীরা প্রৌঢ়দেরকে গোসল করাতো।

স্মৃতি বিজরিত আমার সেই বিষু উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বে বর্তমান অবস্থান আলীকদম উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৫০/৬০ কিলোমিটার দূরে তৈন্‌গাঙ এর পাড়ে দুর্গম ও প্রত্যন্হ এলাকায়। কলকলে বয়ে যাওয়া তৈনগাঙ এর দক্ষিণ পাড়ে ৭০/৭৫ জুমিয়া পরিবার নিয়ে এই পাড়ার নাম তুমুক পাড়া ঘাট। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা এই পাড়ায় অপরাহ্ন হতেই সন্ধ্যা নামে। বাবা হেডম্যান এর দায়িত্ব পালন করার সুবাদে সেখানে বসতি। স্বাধীনতার পর রাজাকারের ভয়ে সেখান থেকে আলীকদম সদরে চলে আসি।
আলীকদমে এসে বিষু হয়ে উঠে আরও মধুর আনন্দের। বিশেষ করে মার্মাদের সাথে সখ্যতা, নতুন বন্ধু বান্ধব প্রাপ্তি, তাঁদের সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত হয়ে নতুন আঙ্গিকে বিষু বা সাংগ্রাইং উদ্‌যাপন। বিষুর পূর্বে প্রত্যেক ঘর থেকে চাঁদা উত্তোলন, যুবক যুবতীরা মিলে পিঠা

তৈরী করা, বৌদ্ধ বিহারে শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘ, শীলাশ্যাং, বা অষ্টমশীলধারীদের মিষ্টান্নদান, মোমবাতী জ্বালিয়ে প্রদীপ পুজা, পঞ্চশীল গ্রহণ আর জায়পোয়ে উপভোগ। নববর্ষে বাদ্য যন্ত্র সহকারে মার্মাদের সাথে মিলে বৌদ্ধ বিহারে যাওয়া, বৌদ্ধ চৈত্য, শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘ ও শীলশ্যাংদের গোসল করানো, পঞ্চম শীল গ্রহণ দানাদি উৎসর্গ আর একে অপরকে পানি ছিটানো ইত্যাদি মধুর স্মৃতিগুলি আজো অম্লান হয়ে আছে। শৈশব থেকে ধর্মীয় পরিবেশে উজ্জীবিত হবার সৌভাগ্য হয়েছে কারণ আমার জেঠা স্বর্গীয় অনুরুদ্ধ ভিক্ষু, আমার আরেক জেঠা স্বর্গীয় ডা. বৃষ কেতু, যার বাড়িতে আমরা ৬/৭ জন ছেলে লজিং থেকে পড়া লেখা করতাম। প্রত্যুয়ে ভোরে আমাদের ঘুম থেকে উঠে বাগান থেকে ফুল ছিড়ে চৈক্ষ্যৎ খালে ধৌত এবং গোসল করে জেঠা বাবার সাথে আরাধনা করতে হত। সকাল সন্ধ্যা আরাধনা করতে করতে আমরা প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। বিষু এলে তো আমাদের আয়োজনে সাজ সাজ রব পড়ে যেত।

আজ হারিয়ে গেছে জায়পোয়ে, পাগুমা, নেচেরা, বুংচেরা আর সেই সংস্কৃতি মন্ডলের পরিচালক গুলো। বর্তমানে বিষু বা সাংগ্রাইং এলে জুয়াতীদের হিড়িক ও তাফলিং শুরু হয়ে যায়। স্থানীয় কিছু নেতার যোগসাজসে বিষু বা সাংগ্রাইং উপলক্ষে আয়োজন করে নৃত্যের জলসা। বর্তমানে এইসব নৃত্য জলসা আয়োজনের পেছনে দাতা থাকে জুয়াতীরা।

আজ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অনেক বন্ধু এইসব ফেস্টিভাল দেখতে, ধারন করতে আগ্রহী। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে আদি সংস্কৃতি ছিল তা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই আমি সেকালে বিষু আর একালের বিষু কোন মিল খুঁজে পায় না। তাই তো বর্তমানে বিষু এলে বন্ধু বান্ধব থেকে দূরে থেকে বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে শীলাশ্যাং বা অষ্টশীল নিয়ে– 'অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা' জপ করি।

লেখক: নিবার্হী পরিচালক, আইসিসিসিএইচটি, পানবাজার, আলীকদম, বান্দরবান।

দক্ষিণ এশিয়ায় ভাষার রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে একুশে ফেব্রুয়ারি

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

মাতৃভাষা একটি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। জনগোষ্ঠীর ভাষার মৃত্যু হলে গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে; যদিও মানুষগুলো জনমিতির বিচারে অস্তিত্বহীন হয় না। যে জাতির মাতৃভাষা স্বীকৃত তার আত্মপরিচয়ও স্বীকৃত। অর্থাৎ মাতৃভাষা একটি জাতির আত্মপরিচয়ের সূচক। দক্ষিণ এশিয়া প্রসঙ্গে এমন একটি মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যেমন দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ ইংরেজ অধ্যাপক মরিস জোনস্ (Morris Jones) বলেন, ভাষা একটি গোষ্ঠীল গুরুত্বপূর্ণ আত্মপরিচয়ের চিহ্ন (Language is perhaps the important mark of group indentification) এবং গোষ্ঠীটির সীমানা চিহ্নিতকারী (a delineator of group boundaries)।

কিন্তু ভাষার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতও আছে। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী গুস্তাভ লা বঁ-র (Gustave Le Bor) বক্তব্য হলো; ভাষার চেয়ে অধিক জটিল, যৌক্তক এবং বিস্ময়কর আর কী হতে পারে? সবচেয়ে জ্ঞানী শিক্ষাবিদ এবং সবচেয়ে সম্মানিত বৈয়াকরণ হয়ত ভাষা ব্যবহারের বিধিসমূহ নির্দেশ করতে পারেন; কিন্তু তারা ভাষা তৈরি করতে অক্ষম (What can be more complicated, more logical, more marvelous than a language? The most is teemed grammarians can do no more than note down the laws that govern languages; they would be rottenly mcapable of creating them)। এমন মন্তব্যে ভাষা বিকাশের স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী প্রক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যা প্রভাবিত করা বিশেষজ্ঞদেরও সম্ভব নয়।

সুতরাং মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হওয়া ছাড়াও ভাষার অন্য মাত্রা (dimension) ও ভূমিকা আছে। এমন একটি মাত্রা ও ভূমিকার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন ভাষার রাজনীতিকরণ হয়, বা ভাষার প্রশ্নে যখন রাজনীতি উত্তাল হয় এবং প্রশাসন নানা ধরনের আকস্মিক ও বিস্ময় কর নীতি অনুসরণ করে বা প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দক্ষিণ এশিয়ায় এমন ব্যাপার ঘটেছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে। অবশ্য উল্লেখ্য, এমন ঘটনা ঘটেছে এই অঞ্চলে উপনিবেশ আমলে ও উপনিবেশ শাসনের অবসানের পর। এই চারটি দেশেই ভাষার রাজনীতি রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং প্রশাসন ও সংবিধানকে প্রভাবিত করেছে। এমন একটি নিরিখে দক্ষিণ এশিয়া একটি বিশেষভাবে চিহ্নিত অঞ্চল হতে পারে।

ভাষার রাজনীতির অনিবার্য ফল হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ায় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়েছে এবং যার ধারাবাহিকতায় ভাষাভিত্তিক জাতিবাস হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। বলাবাহুল্য ভাষার রাজনীতিসম্পৃক্ত এমন ঘটনাবলি থেকে দক্ষিণ এশিয়াসহ সারা বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রই পাল্টে গেছে। ভাষার রাজনীতির কারণে স্বাধীন ভারতের অনেক রাজ্যের প্রশাসনিক সীমানা বদলাতে হয়েছে। অন্যদিকে ভাষার রাজনীতি শ্রীলঙ্কায় দীর্ঘদিন ধরে চলমান জাতিগত সংঘাতের জন্ম দিয়েছে (শোনা যাচ্ছে

সামরিক সমাধান প্রায় আসন্ন) অর্থাৎ ভাষার রাজনীতি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক ঘটনা ও অঘটনের নেপথ্যে ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং দক্ষিণ এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা প্রসঙ্গটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য স্মর্তব্য পাকিস্তানবাংলা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালির ভাষা আন্দোলনটিই বড়োমাপের ভাষার রাজনীতির দৃষ্টান্ত। এই বড়মাপের ঘটনাটির ইতিহাস ঐতিহাসিক পটভূমি দীর্ঘ ও গভীর। আর এমন পটভূমির সঙ্গে জড়িয়ে উপনিবেশ ভারতে হিন্দুমুসলমা নের সাম্প্রদায়িক চেতনা উৎসারিত পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড।

সাধারণভাবে বলা হয়, বাঙালির বাংলাভাষার আন্দোলনের ইতিহাসের সূচনা ১৯৪৭৪৮ থেকে। আপাত দৃষ্টিতে হয়ত তাই। কিন্তু এমন ইতিহাসের গভীর শেকড় আছে। একটি প্রশ্নের প্রেক্ষাপট সন্ধান করতে গিয়ে এই গভীর ইতিহাস অনিবার্য হয়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ১৯৪৭ এর জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর প্রস্তাব করেন; এবং তার ফলে পাকিস্তানে ভাষার রাজনীতির সূচনা হয়। আরো বলা হয় এর ফলে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের মাতৃভাষা বাংলার সাংবিধানিক দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অনিবার্য হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলোঃ ড. জিয়াউদ্দীন কেন উর্দুর প্রস্তাব করেছিলেন? এটা তো তার অজানা থাকার কথা নয় যে, পাকিস্তানের মাত্র দু'ভাগ নাগরিক উর্দু ভাষায় কথা বলতো। উপরন্তু তিনি যে এটা জানতেন না যে, ভবিষ্যৎ পাকিস্তানে মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলা নাগরিকরাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ড. জিয়াউদ্দীন ছিলেন একজন উপাচার্য্যকৃতবিদ্য মানুষ। কাজেই তিনি যে এসব তথ্য জানবেন তা যৌক্তিকভাবেই অনুমান করতে হয়। আর এটা তো জানা কথা যে, তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন না যে আবেগধর্মী সস্তা কথা বলবেন। কাজেই প্রশ্ন এখন; তার মুখ থেকে কোনো যুক্তি ও পরিপ্রেক্ষিতে এমন প্রস্তাব উচ্চারিত হয়েছিল?

ড. জিয়াউদ্দীন রাজনীতিবিদ না হলেও তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক চেতনালগ্ন একজন সচেতন মুসলমান ছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক যে মানসজগৎ তা থেকে বিচ্ছিন্ন পথে তিনি আপন ভুবনে, মগ্ন থাকবেন তা নয়। উপরন্তু তার বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার তীর্থভূমি।

যে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ও কারণে ড. জিয়াউদ্দীনের এমন প্রস্তাব ছিল তার শেকড় ১৮৬৭ তে। সে বছর বেনারসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ ভারতের অভিন্ন ভাষা হিসেবে হিন্দির সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বেনারসের উর্দুভাষী মুসলমানদের ওপর হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। তাদের সিদ্ধান্তে এটাও ছিল যে, ভবিষ্যতে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হলে রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দি। তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে স্তিমিত ও সীমিত আকারে হলেও দৃশ্যমান আন্দোলন শুরু হয়, কাজেই বেনারসের মুসলমান সম্প্রদায় উর্দু ভাষা রক্ষার রাজতৈনিক তৎপরতা শুরু করে। এভাবেই দক্ষিণ এশিয়ায় ভাষার রাজনীতির সূচনা হয়েছিল। এমন ভাষার রাজনীতি ভাষার সাম্প্রদায়িকীকরণও করল। হিন্দি হিন্দুর ভাষা; আর উর্দু মুসলমানের। অর্থাৎ ভাষারও ধর্ম তৈরি হয়ে গেল।

কিন্তু জানা কথা, হিন্দি ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল দিল্লি এলাকায় এক সংকর ভাষা হিসেবে এবং তা মুঘল আমলে। হিন্দি ভাষায় ছিল স্থানীয় অনেক উপভাষার সংমিশ্রণ। ভাষাটি অভিন্ন ভাষা হিসেবে চালু হয়, বিশেষ করে সেনাবাহিনীতে এসে ভাষাটিতে শাসকের ফার্সি

ভাষার অনেক শব্দ ছিল। বলা যায় মুঘল আমলের হিন্দি ভাষার ফার্সি শব্দের প্রাধান্য ছিল। উপনিবেশ আমলে এই সংকর ভাষাটির নাম হয় হিন্দুস্তানি। সারা হিন্দুস্তানেই অভিন্ন ভাষা হিসেবে চালু ছিল হিন্দুস্তানি। কিন্তু উনিশ শতকের সূচনা থেকেই হিন্দুস্তানি ভাষার সাম্প্রদায়িকীরণ শুরু হয়। হিন্দুস্তানি ভাষা দুভাগ হয়ে যায়। হিন্দুস্তানি থেকে ফার্সি শব্দ তুলে দিয়ে সংস্কৃত শব্দ সংযোজন করে দেবনাগরী লিপিতে লেখা শুরু হলে তা হয়ে উঠে হিন্দুর ভাষা হিন্দি। আর বিপরীতে আরবি/ফার্সি শব্দসহ আরবি লিপির হিন্দুস্তানি হলো মুসলমানের উর্দু ভাষা। অর্থাৎ ভাষার সাম্প্রদায়িক চারিত্র্য ধারণ শুরুহলো এভাবে ১৯৪৭এ ড. জিয়াউদ্দীনের প্রস্তাবের পটভূমি ছিল এটাই। পাকিস্তানের কতভাগ নাগরিক উর্দু ভাষায় কথা বলতো তা নয়, বরং মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সূচক ও দ্যোতক ভাষা হিসেবে উর্দুকে বিবেচনায় নিয়ে তিনি এমন প্রস্তাবটি করেছিলেন।

১৮৬৭এ বেনারস সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন মুসলমান সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য নেতা স্যার সৈয়দ আহমেদ তার প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এরপর থেকে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় আর কোনো ব্যাপারে অভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করতে পারবে না। অর্থাৎ তথাকথিত হিন্দুমুসলমান রাজ নৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদের সূচনা বেনারস ভিত্তিক ভাষার রাজনীতি থেকেই, স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের দূরদর্শী মন্তব্য ছিল। এখন হয়ত দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ্য বৈরিতা নেই। কিন্তু তাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কারণে ভবিষ্যতে এই বৈরিতা ভয়ানক বেড়ে যাবে। যিনি ততদিন বেঁচে থাকবেন, তিনি তা দেখবেন।' বেনারসের ঘটনাটি প্রসঙ্গে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর জীবনীকার হেক্টর বলিথো (Hector olitho) লিখেছিলেন, এভাবেই সূচিত হলো মানুষগুলোর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, যার উত্তরসূরি হয়েছিলেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, যদিও বহু বছর পর তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, তার নিয়তি ছিল সৈয়দ আহমেদ এর এই বিরক্তিকর ভবিষ্যদ্বাণী রূপায়ণ করা (Thus was born the thought of the parting of the peoples, to which Mohammad Ali Jinnah became the heir, although many years were to pass before he acknowledged that it was his destiny to fulfil Syed Ahmad Khan's disturbing prophecy)' । সুতরাং ১৯৪৮এ তিনি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ও কার্জন হলে বক্তৃতায় পূর্বপ্রস্তুত সিদ্ধান্ত উচ্চারণ করেছিলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তিনিও ড. জিয়াউদ্দীনের মতো পাকিস্থানের উর্দুভাষি নাগরিকের অনুপাত নয়, বিবেচনায় নিয়েছিলেন মুসলমান গোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে উর্দুকে। অবশ্য জীবনসায়াহ্নে ব্যক্তিগত চিকিৎসকের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, তার সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল।

পাকিস্তানে সংখ্যালঘুর মাতৃভাষার ধর্মীয় আবেগের কারণে রাষ্ট্রভাষা করতে গিয়ে ভাষার রাজনীতি ও প্রচন্ড শক্তিশালী প্রতিবাদী/প্রতিরোধী বাঙালির ভাষাআন্দোলন উসকে দেয়া হয়েছিল। সফল ভাষাআন্দোলনের পরিণতিতে বাঙালিদের জন্য ছাড় দিয়ে ১৯৫৬র সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে রাজনীতি না হলে, তুমুল ভাষাআন্দোলন না চলতে এই সংবিধানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুই স্থান পেত। অর্থাৎ ভাষার রাজনীতি পাকিস্তানের সংবিধানের চরিত্র প্রভাবিত করেছিল।

শ্রীলঙ্কায় ঘটেছিল উল্টো ঘটনা, যা আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক ছিল বৈকি। দেশটির সিংহভাগ মানুষের মাতৃভাষা সিনহালা। অপরদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দুদের ভাষা তামিল।

কেমন আছ? গদ পদ সুরে রাত্রি বলল ভাল নেই। কেন? তোমার ফোনের আশায় দিন গুনছিলাম আমার তো কল করার কোন উপায় নেই। প্রভাত হোঁ হোঁ করে হেসে বল ও আচ্ছা। এর পর চলতে থাকে কথা। বাশির টানে যেমন ব্যাকুল হয়ে রাধিকারা ছুটে আসত তেমনি প্রভাতের ফোনে ছুটে আসত রাত্রি। একদিন প্রভাত রাত্রিকে বলছে তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। কিভাবে আমাদের দেখা হতে পারে? রাত্রি বলল এত খুব সহজ কাল বিকালে আমাদের দেখা করলে হয়। কবে, কখন, কোথায়? কাল বিকাল পাঁচটায় ধানমন্ডির লেকে আমরা দেখা করব- Ok. promise? ok promise. রাত্রে আর দুই জনেই ঘুম আসে না। দুইজন দুই জনকে Message পাঠাতে থাকে আমি তোমার পানে পথে চেয়ে রব। এই অবস্থা দেখে মনে হয় খাঁচার ভিতর বন্দী পাখি যেমন মুক্ত অঙ্গনে ওড়ার উল্লাসে ফটফট করে তেমনি তারা দুই দুই জনের দেখার অপেক্ষায় ছটফট করছে। তখন তাদের মনে একটাই গান বাজে 'সময় যেন কাটেনা বড় একা একা লাগে।' ভোর হল সকাল গড়িয়ে দুপুর থেকে বিকাল। বাড়ি থেকে বই কেনার কথা বলে বের হল রাত্রি। ঠিক ঘড়ির কাটায় চারটা প্রভাত লেকে। তার মনে অনেক ভাবনা অস্তিরতাঃ মধ্য দিয়ে কাটছে তার সময়। সে ভাবছে রাত্রি যদি আমাকে দেখে অপছন্দ করে। রাত্রির ও ভাবনা একই। হঠাৎ ফোন এল ঘড়ির কাটার ৪ টা ৫০ মিনিট। কোথায় তুমি? আমি লেকের সিঁড়ির ওপর বসে তোমার প্রতিক্ষায় আছি। জবাবে প্রভাত আমি এক্ষুনি আসছি। মোবাইলের চার্জ শেষ প্রভাত সিঁড়ির ওপর এসে বসে আছে প্রভাত। সে মনে হয় তার স্বপ্নের রানীর দেখা পেয়েছে। হঠাৎ তার মনে কৌতুহল হল দেখা যাক যার সাথে আমি এতদিন কথা বলেছি সে আমাকে চিনতে পারে কিনা? পাশে রাত্রি বসে আছে তার অপর পাশে এসে বসল প্রভাত। প্রভাতকে দেখে রাত্রির মনে অনেক কৌতুহল হল আমার প্রভাত দেখতে যদি এত সুন্দর হত এই আমার প্রভাত নয় তো যা তা কি করে হয় এই যদি প্রভাত হতো তাহলে এখানে এসে আমার কাছে অবশ্যই ফোন করত। বিকেলে গড়িয়ে যাচ্ছে প্রভাতের কোন খরব নেই ফোনের উপর ফোন শুধু বার বার শোনা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে মোবাইল সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তারপর ও রাত্রির বিশ্বাস প্রভাত আসবেই। সে অনেক সময় ধরে লক্ষ্য করছে। যে তার বিপরীত পাশে বসে থাকা সুদর্শন যুবকটি তার দিকে বার বার তাকাচ্ছে। তার কৌতুহল আরও বেড়ে গেল এক পর্যায়ে অনুমান করল এই বোধহয় তার স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র প্রভাত। সে উঠে গিয়ে বলল। Excuse me আমি আপনার সাথে কথা বলতে পারি। হ্যাঁ, আমি যদি ভুল না করি আপনি কি প্রভাত? সে আর প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে পারল না তাকে ও নিজেকে। ব্যাচ সত্য প্রকাশ। দুইজনই এক সাথে বলে উঠল, কত সুন্দর তুমি! এতদিন কিভাবে নিজেকে আড়াল করে রাখলে? শুধু তোমাকে পাওয়ার জন্য আমার এ প্রতিক্ষা। এমন সব কথা বলতে বলতে দুইজনে হেটে চলতে থাকল ভালবাসার কাল ধরে বহু দূরে যেখানে মাটি ছুঁয়ে ভালবাসার জন্য ফোটে নানান রঙ্গের ফুল।

* ছাত্র, চারুকলা, ঢা. বি.

চিম্বুক পাহাড়ের পথে

করুণাময় চাকমা

প্রতিবারই যখন বাড়িতে যাই এই বিশাল চিম্বুক পাহাড়ের ওপর দিয়ে মনের মধ্যে এক প্রকার শিহরণ দোলা দিয়ে যায়। সর্পিল আকারে দক্ষিণে বয়ে যাওয়া এই চির সবুজ পাহাড়ের সৌন্দর্য বার বার আর্কষণ করে আমাকে। চিম্বুক পাহাড়ের পূর্বে সারি সারি সবুজ পাহাড়, পশ্চিমে ছোট পাহাড় এবং অনেক দূরে বিস্তির্ণ এলাকাজুড়ে চট্টগ্রাম বিভাগের পূর্ব পাশের কিছু এলাকা দেখা যায়। পূর্বে যতদূর চোখ যায়-তাকালে মনে হবে বিশাল নীল আকাশ সবুজ পাহাড়ের সাথে মিতালী করেছে। চিম্বুক পাহাড়ের পূর্ব পাশ দিয়ে আপন গতিতে আকাবাঁকা পথ ধরে বয়ে যাচ্ছে সাংগু নদীটি। এই চির সবুজ চিম্বুক পাহাড়ে ঘন সবুজ অরণ্য আমার প্রকৃতি পিয়াসু মনে কোন দিন ভাটা পড়েনি। প্রতিবার বাড়ি যাওয়ার পথে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসা হিমেল বাতাস শহরের জঞ্জাল পীড়িত এই মনে প্রশান্তি এনে দেয়। বর্ষাকাল এবং শীতকালে যখন যাওয়ার সুযোগ হয় পাহাড়ের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মেঘরাশি আমার মনকে উদ্বেলিত করে। দূর থেকে মনে হয় পাহাড়ের গায়ে সবুজ অরণ্যের সাথে লেপটে আছে সাদা মেঘরাশি। যতপারি এই পাহাড়ের সৌন্দর্য বুকভরে দেখে নেয়ার চেষ্টা করি। শীতের ধূসর কুয়াশা ঢাকা চিম্বুকের মেঠো পথ, মোঠো পথ ধরে দূর থেকে হেঁটে আসা পিঠে ঠুরুং ঝুলানো ম্রো নারী প্রকৃতির এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য প্রকৃতি পিয়াসু মনে অন্যরকম এক অনুভূতির জন্ম দেয়।

যতদূর জানা যায় এই পাহাড়টির নামকরনও হয়েছে চিম্বুক নামের এক ম্রো ব্যক্তির নামানুসারে। পাহাড়টির আশে-পাশে যুগ-যুগ ধরে বসবাস করছে ম্রো আদিবাসী সম্প্রদায়। প্রকৃতির সাথে মিশে থাকা এই ম্রো-দের জীবন যাত্রা, সংস্কৃতি সত্যিই আকর্ষণীয়। আধুনিকতার এই যুগে একটু ও সভ্যতার ছোঁয়া লাগেনি ম্রো সমাজে। যদিও বর্তমানে কিছুটা পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। কি সহজ-সরল তাদের জীবন-প্রণালী যেন প্রকৃতির সাথে মিশে থাকা পৃথিবীর আদিম সন্তান। একবার স্বচক্ষে না দেখলে উপলব্ধি করার অবকাশ নেই। ম্রো-রা নিজেরাও বিশ্বাস করে তারা এই পৃথিবীর আদি সন্তান এবং প্রকৃতিরই অংশ।

বেশ কয়েক বছর পূর্বেও এই চিম্বুক পাহাড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে কোন কিছুই ছিল না। বিগত দশ কি এগারো বছর হলো পাহাড়ের বুক চিড়ে বান্দরবান থেকে থানচি পর্যন্ত সেনাবহিনীর তত্ত্বাবধানে একটি পাকা রাস্তা করা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যোগাযোগ ব্যবস্থার এই উন্নয়ন স্থানীয় অধিবাসীদের ভাগ্যের পরিবর্তন আনতে পেরেছে। তারা এই বলে উন্নয়নের জোয়ার তুলে ধরেন যে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে স্থানীয় জুমিয়ারা তাদের উৎপাদিত ফসলাদি সহজেই শহরে পাঠাতে পারছে। এভাবে তারা উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য ঘরে তুলতে পারছে। পাশাপাশি পিছিয়ে পড়ে থাকা ম্রো সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও সৃষ্টি করা যাচ্ছে বলে অনেকেই ধারণা করেন। তবে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে উন্নয়নের পাশাপাশি অনুন্নয়নের একটি ধারাও আতংক হিসেবে উপস্থিত হচ্ছে-স্থানীয় আদিবাসীদের জন্য। বিগত কয়েক বছরে এর প্রমাণ ও পাচ্ছি আমরা। চিম্বুকের এই পথ ধরে গেলে চোখে পড়বে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প সম্প্রসারণের

বিভিন্ন পদক্ষেপ। স্থানীয় আদিবাসীদের প্রথাগত জমিজমা দখল ক রে ট্যুরিজম রিসোর্ট সম্প্রসারণের উদ্যোগে ও চলছে বেশ জোড়ে শোরে। তাও করা হচ্ছে সেনাবাহিনীর একক তত্ত্বাবধানে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই প্রধান উপদেষ্টা 'নীলগিরি' নামক পর্যটন রিসোর্টটি উদ্বোধন করেছেন। স্থানীয় আদিবাসীদের আরোপিত নাম উপেক্ষা করে কয়েকটি জায়গার নামও দেয়া হয়েছে বিকৃতভাবে। যেমনজিয়া পুকুর, জীবন নগর ইত্যাদি নামে কয়েকটি জায়গা পরিচিতি পাচ্ছে লোকজ নের কাছে। হয়তো কোন একদিন এই চিম্বুক পাহাড়টিও নাম পরিবর্তন হয়ে অন্য একটি নামে পরিচিতি পাবে। দেখা যাচ্ছে ভূমি বেদখলকারীরা শুধু স্থানীয় আদিবাসীদের জমি, পাহাড় থেকে উচ্ছেদ করে ক্ষান্ত হচ্ছেনা। ভূমি সন্তানদের পাশাপাশি যুগযুগ ধ রে পরিচিতি পাওয়া জায়গা গুলির নাম ও তারা উচ্ছেদ করার পায়তারা করছে। এজন্যই হয়তো স্থানীয় আদিবাসীদের দেয়া শতবছরের পুরনো নাম তাজিংডং পাহাড়টিও পরিচিতি পায় বিজয় নামে। কি সুন্দর তাজিংডং পাহাড়ের নাম। এটি একটি মার্মা ভাষার শব্দ যার অর্থ গভীর অরণ্যের পাহাড়। জানা গেছে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে কৃত্রিম ইকোপার্ক স্থাপন করবে। জানা যায়সরকার বিগত সময়ে তিনটি জায়গাকে বাছাই করেছে ইকোপার্ক স্থাপনের জন্যজীবন নগর, হরিণঝিরি এবং টাকের হাট। সরকার বিগত সময়ে সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণের নামে প্রায় দশ হাজার একর ভূমি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই প্রক্রিয়াটি এখনও চলমান রয়েছে। এর মধ্যে উলেস্নখযোগ্য হচ্চে চিম্বুক পাহাড়ের পূর্ব পাশে রুমা উপজেলায় সেনাক্যাম্প সম্প্রসারণের জন্য প্রাথমিকভাবে সরকার ৯৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যেখানে প্রায় ৩৯২টি আদিবাসী গ্রাম রয়েছে। সুয়ালক ও টংকাবতী ইউনিয়নে ও একই কায়দায় সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য ১১ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল সেই ১৯৯০৯৩ সা লে। যেখানে যুগযুগ ধ রে বসবাস করে আসছে ম্রো আদিবাসী সম্প্রদায়। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ম্রো আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতা, সুয়ালক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রাংলাই ম্রোকে তথাকথিত যৌথবাহিনী গ্রেপ্তার করেছিল অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে। বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি এটি ছিল তার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন একটি সাজানো নাটক। গত ২২ জানুয়ারী ২০০৯ প্রথম আলো পত্রিকায় রাংলাই ম্রো সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। সেনাবাহিনীরা তাঁর উপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে বলে তিনি জানান। নির্যাতনের একমাত্র কারণ ছিল তিনি সুয়ালক ও চিম্বুকের কাপ্রু পাড়া থেকে ম্রোদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। এই নির্যাতনের কাহিনী শুনে আমাদের আতঙ্কে শিহরে উঠতে হয়। তিনি দাবী করেছেন নিজ জাতিসত্তার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার থাকার কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যাতে অন্যরা ও ভয় পায় এবং কোনো কথা না বলে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের বর্বর কর্মকান্ড দেখে আমরা অবাক না হয়ে পারি না। তাহলে কি বলা যায় দেশে কোন সংবিধান নেই, নেই কোন আইনের শাসন? 'জোড় যার মুল্লুক তার'এই দর্শনেই কি চলছে এই স্বাধীন রাষ্ট্রটি? হয়তো এ কারণেই জরুরি অবস্থার সময়ে ১৯ মার্চ ২০০৭ তারিখে গ্রেপ্তারের পর পাশবিক নির্যাতনের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে হতা করা হয়েছিল মধুপুরের আদিবাসী নেতা চরেস রিছিলকে। নিজের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে এই যদি পরিণতি হয় তাহলে কার কাছে এই অপরাধের বিচার চাইবে এই সহজসরল আদিবাসীরা?

গত ২০০৮ জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমার সুয়ালক ও টংকাবতী ইউনিয়ন থেকে

উচ্ছেদ হওয়া ম্রোদের গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। কিছুটা পথ হেঁটে আর কিছুটা টেম্পোতে করে ঐ গ্রামে গিয়ে পৌঁছি। গ্রামে ঢোকার সাথে সাথে এক বৃদ্ধার মুখোমুখি হলাম আমরা। সম্ভবত অপরিচিত মুখ দেখেই আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন। কেমন আছেন জিজ্ঞেস করতেই তাঁর সরল অভিব্যক্তি "কি করবো বাবা, বুড়া মানুষ কাজকাম কর তে পারি না, এই কোন রকমে দিনকাল যাচ্ছে"। গ্রামে গিয়ে মনে হলো ভূমি বেদখলকারীদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই এই সহজসরল মানুষ দের প্রতি। নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে কোন রকম একটা জায়গায় পুনর্বাসন করেই দায়িত্ব শেষ বলে মনে করেছে তারা। বিদ্যালয়েও যেতে পারছিলনা উচ্ছেদ হওয়া ম্রো আদিবাসী সম্প্রদায়ের সন্তানেরা। তাই ছেলে মেয়েদের নিয়ে তারা উদ্বিগ্নে দিন কাটাচ্ছিলেন। এমনিতেই আর্থিক অবস্থা খুব বেশি ভালো না।

আবার জায়গা জমি হারিয়ে তারা এখন পথে বসেছে। ভাবি এই নিরপরাধ আদিবাসীরা কার কাছে এর সমাধান চাইবে। ভেবে কোন সদুত্তর মেলে না আমার কাছে।

ঢাকা থেকে যাওয়ার পথে সাতকানিয়া পার হলেই দূরে পূর্ব দিকে সবুজ অরণ্যে ঘেরা সুউচ্চ চিম্বুক পাহাড়টি দেখা যায়। যাত্রা পথে আনমনে ভাবি সবুজ অরণ্যে ঘেরা চিম্বুক পাহাড়টির আশে পাশে প্রকৃতির সাথে মিশে থাকা আদিবাসী মানুষ কেমন আছে? উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া আদিবাসী ম্রোস ম্প্রদায়ের মানুষেরা কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন? এই যাত্রাপথে নানা প্রশ্ন উদিত হয় আমার এই অশান্ত মনে। ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তির এগারো বছর অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও চুক্তি বাস্তবায়নে কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। উপরন্তু চুক্তি বানচালের নানা পায়তারা করা হয়েছে বিগত সময়ে। বর্তমান নির্বাচিত সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতিহারে পার্বত্য চুক্তির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তারপরও পার্বত্য আদিবাসীরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো বাংলাদেশও একদিন বিশ্বের দিকে তাকিয়ে বিবেকের উদয় হবে। কোন একদিন ঘোষণা করবে পার্বত্য চট্টগ্রাম শুধু আদিবাসীদের। ঠিক যেমন সম্প্রতি ২০০৯ মার্চ মাসে ব্রাজিল সরকার একটি রায় দিয়েছে আমাজান অববাহিকায় ১০ লাখ ৭০ হাজার হেক্টর জায়গা শুধু যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসা আদিবাসীদের জন্যে। সংরক্ষিত ঐ এলাকায় ২০ হাজার আমাজানীয় আদিবাসী বাস করে। এ ব্যাপারে ব্রাজিলের সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে বলা হয়, উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত রাজ্য রোরাইমা দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর একক রাজ্য হিসেবেই সংরক্ষতি থাকবে। এর ফলে বাইরে থেকে এসে ধান চাষাবাদকারী খামার মালিকদের ঐ রাজ্য ত্যাগ করতে হবে। আমরা আশান্বিত হয় বিশ্বের দিকে তাকিয়ে। গত ২০০৮ সালে অষ্ট্রেলীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী কেভিন রাড আদিবাসীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন তাদের অতীত কর্মের জন্য। বলিভিয়ার আদিবাসীরা তাদের ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। সেখানে বর্তমানে শাসন করছেন ইভো মোরালেস নামে একজন আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রেসিডেন্ট। তাহলে কি আমরা স্বপ্ন বুনবো অদূর ভবিষ্যতে এই বাংলাদেশের আদিবাসীরা তাদের অধিকার ফিরে পাবে। মানুষের মত নিজ অধিকার নিয়ে তারা স্বদেশে বেঁচে থাকতে পারবে। নাকি এই দূর্দশাই হবে আদিবাসীদের ভাগ্যের নিয়তি।

লেখক: ছাত্র, এম.এস.এস. ঢা.বি,
সভাপতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

মং রাজা পাইহ্লা প্রু চৌধুরীর অকাল মৃত্যু: আমাদের দুগর্ম পদযাত্রা

শ্রী প্রগতি খীসা

২২ শে অক্টোবর সকাল সবে মাত্র পূর্ব দিগন্তে দিবাকরের আলোক রশ্মিতে পৃথিবী ঝলমল করতে শুরু করেছে। এমনি সময়ে আমার সেলফোনে অপর প্রান্ত হতে কাঁপা কাঁপা স্বরে একটি করুন শব্দের কণ্ঠ ভেসে এল এই বলে যে, ওহে শুনেছো সব শেষ। সব শেষ। বললাম স্থির হও রে ভাই, বল কি শেষ হয়ে গেছে? এবার সোজাসাফটা জবাব আমাদের প্রাণপ্রিয় মান্যবর মং রাজা পাইহ্লা প্রু চৌধুরী আজ ভোরে ৬টায় মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটায় অকুস্থলে প্রাণ হারিয়েছেন। এ মৃত্যু বড়ই মর্মান্তিক। অসময়ে চলে গেছেন ক্ষণ জন্ম গৌরবাদীপ্ত পৌরুষ রাজা বাহাদুর।

ভারতীয় উপ মহাদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চট্টগ্রাম-পার্বত্যঞ্চলে পাহাড়ী আদিবাসী রাজাদের রাজ্য শাসন ছিল এক চেটিয়া। এ পর্যন্ত ইতিহাস গবেষকগণ যেসব ইতিহাস লিখে গেছেন তাতে দেখা যায় যে, নিকট অতীতে ও অঞ্চলের রাজা বা নরপতিগণ চট্টগ্রাম-পার্বত্যঞ্চল স্বীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রজা শাসন করেছেন। চট্টগ্রাম পার্বত্যঞ্চলে প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসনাধীনে চলে আসার পর পরই রাজার স্বার্বভৌমত্ব ক্ষমতা, মর্যাদা ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সর্ব নিম্ন পর্যায়ে খর্ব করা হয়। এমনকি রাজা পদ মর্যাদা খারিজ করে দিয়ে চিফ পদ মর্যাদায় নামিয়ে আনা হয়। ১৮৬০ সালে ২০ শে জুন পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জেলার সৃষ্টির পূর্বে এ অঞ্চলের নাম ছিল কার্পাস মহল (১৭১৫-১৮৭০)। ১৮৭০ সালে চাকমা রাজ সার্কেলের উত্তরাংশের রামগড়-মায়নী (খাগড়াছড়ি) অঞ্চলকে নিয়ে মং সার্কেল সৃষ্টি করে তৎকালীন বৃটিশ সরকার। ফলে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমা বোমাং ও মং সার্কেল নামে পৃথক ৩টি সার্কেল পূর্ণ: গঠন করা হয় এবং রাজা শব্দটি অবলোকন করে তৎস্থলে Chief বা সার্কেল চিফ শব্দটি সন্নিবেশিত করে তিনটি সার্কেলে ৩ জন চিফ পদায়ন করা হয়। মূলত: তখন থেকেই এদত: অঞ্চলের পাহাড়ী রাজাগণ চিফ হিসেবে পরিচিত লাভ করতে থাকেন। বৃটিশ সরকারের নতুন প্রবর্তিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯০০ ক্ষমতা বলে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার একটি তরবারী প্রদানের মাধ্যমে রাজা বা চিফদের অভিষিক্ত করে থাকেন। রাজা পদটি বংশানুক্রমিক। তবে উল্লেখ করা যায় যে, চাকমা রাজার রাজপদে অভিষেকের ঐতিহ্য অনুযায়ী রাজার জৈষ্ঠ্যপুত্রই পরবর্তী রাজা হিসেবে নিযুক্ত হন। অন্যদিকে বোমাং ও মং রাজাদের ক্ষেত্রে রাজপরিবারের সর্ব জৈষ্ট সদস্য পরবর্তী রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। এ অভিষেক প্রথা আবহমান কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রচলিত আছে। সার্কেল চিফ এতদ অঞ্চলের জনগনের কাছে রাজা হিসেবে সুপরিচিত এবং জনগণের কাছে দেবতাতুল্য সকলের নিকট পরম শ্রদ্ধার পাত্র। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৃটিশরা চট্টগ্রাম পার্বত্যঞ্চলে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চলের রাজা যাবতীয় প্রশাসন পরিচালনা করতেন। এখানে রাজা শুধু একজন শাসক নন। তিনি সামাজিক ও জাতীয় প্রধান ও বটে। রাজার সংবিধানিক কোন পদ পর্যাদা পদ মর্যাদা বা ক্ষমতা না থাকলেও ঐতিহ্যগতভাবে তিনি প্রকৃত অর্থে একজন রাজা এবং তাঁর পদ মর্যদা সর্বোচ্চ পর্যায়ের অন্য কোন সরকারী পদধারী ব্যক্তি বা কর্মকর্তার উর্দ্ধে। সরকারী নথি পত্রে

বা প্রজ্ঞাপণে রাজাকে সার্কেল চিফ হিসেবে সম্বোধন করা হয়।

সার্কেল সীমার আওতায় বসবাসকারী জন সাধারণ রাজাদের অধিভুক্ত প্রজা। সার্কেল চিফ তাঁর সার্কেলেভুক্ত জেলার কর্মর জেলা প্রশাসকের উপদেষ্টা হিসেবে স্বীকৃত এবং জেলা প্রশাসকগণ সার্কেলের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে চিফের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন। চিফের পরামর্শ বা অনুমোদন সাপেক্ষে জেলা প্রশাসকগণ সার্কেলের অধিভুক্ত মৌজার হেডম্যান ও কার্বারীদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। ইহা ছাড়াও রাজা তাঁর সার্কেলের রাজস্ব আদায়, তত্ত্বাবধান ও প্রজাদের সামাজিক আচার বিচার নিষ্পন্ন করেন। পাহাড়ী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক আদালত হিসেবে রাজার আদালতই সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে বিবেচিত। সামাজিক বিচারে কেউ যদি রাজ আদেশ অমান্য করেন। সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক বা আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষই রাজার আদেশের রায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন। কোন ব্যক্তি রাজার আদেশের সংক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন এবং নিজেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এই রূপ ধারণা করে থাকলে তাহলে রাজার আদেশের প্রতিকার চেয়ে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের আদালতে রিভিউ আপীল করা যায়। এ ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার যে আদেশ প্রদান করবেন সে আদেশই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। তবে রাজার আদেশের বিরুদ্ধে খুবই কমই রিভিউ আপীল হয়ে থাকে।

চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম পুনঃ জাগরণের ক্ষেত্রে মং রাজাদের ভূমিকা অপরিসীম। সর্বপ্রথম রং কংজয় বাহাদুরকে তৎকালিন বৃটিশ সরকার সোর্ড অব অনার উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে মহামুনিতে বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে মেলার আয়োজন করতেন যা এখনও এ অঞ্চলের পাহাড়ী বাঙ্গালীদের কাছে মহামুনি মিলন মেলা হিসেবে চির স্মরণীয় হয়ে আছে। ২য় রাজা ক্যজ সাইন, ৩য় রাজা রাজকুমারী পেংমা, ৪র্থ রাজা নরবধি ১৮৭০ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারি বৃটিশ ডেপুটি কমিশনার মিঃ ফের্ড কর্তৃক রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ৫ম রাজা ক্যজ প্রু, ৬ষ্ঠ রাজা নিপ্রু সাইন ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে রাজাভিষেক হয়ে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তাঁর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় রাজকুমারী নেংউমা ১৯৩৬ হতে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রানী নেংউমা কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় হতে আইন শাস্ত্রে এম এ ডিগ্রী লাভ করে পাবর্ত্য চট্টগ্রামে সর্ব প্রথম আইনে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে গৌরব অর্জন করে। তৎপুত্র নিপ্রু সাইন ১৯৫৩ সালে রাজপদে অভিষিক্ত হন এবং একই দিন চাকমা রাজা ভূবন মোহন রায়ের কন্যা নিহার দেবীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আখাউড়া রনাঙ্গনে অবৈতনিক কর্ণেল হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এবং মুক্তি যোদ্ধা প্রশিক্ষণ শিবিরে বৈদেশিক অর্থ বন্টন দপ্তর দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা চলাকালিন সময়ে মুক্তিযোদ্ধা ও প্রজাদের জন্য রাজভান্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ফলে মং রাজপ্রসাদ হানাদার বাহিনী কর্তৃক বার বার আক্রান্ত হয় এবং ব্যাপক হারে ক্ষতি সাধন করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি খাগড়াছড়িতে গর্ভনরে দায়িত্ব পালন করেন এবং কৃষি কাজে বিশেষ অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট স্বর্ণ পদকে ভূষিত করেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে রানী নিহার দেবী ১৯৮৫ হতে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। রানী নিহার দেবী উচ্চ বিদ্যালয়, মাটিরাঙ্গা গিরি মৈত্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করে সার্কেলের প্রজা সাধারণকে শিক্ষা দীক্ষায় এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং পাহাড়ী বাঙালির সম্প্রীতি অটুট বন্ধন রচনায়

পথিকৃৎ ছিলেন এই মহিয়সী রানী। রানী নিহার দেবী মৃত্যু বরণ করলে রাজপদে নিয়ে উত্তরাধিকার মামলায় আইনী লড়াই শেষে সম্প্রতি প্রয়াত পাইহ্লা প্রু চৌধুরী মং সার্কেলের দশম রাজা হিসেবে ১৯৯১ সালের ১৭ মার্চ রাজা সিংহাসনের আরোহন করে। তিনি প্রকৃত পক্ষে একজন গণমানুষের রাজা ছিলেন। ভদ্র নম্র স্বভাব সুলভের এই রাজা আমৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রজাদের সেবক হিসেবে কাজ করে গেছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির এই বিমূর্ত প্রতীক সদালাপী রাজা বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে গণমানুষের কল্যাণের জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় UNDP-কর্তৃক আয়োজিত দারিদ্র বিমোচন কৃশলপত্র প্রনয়ণ শীর্ষক কর্ম শালায় যোগদান শেষে ফিরতি পথে সড়ক পথে দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। এ অকাল মৃত্যুই প্রমাণ করে রাজা হিসেবে তিনি কতটুকু সেবার জন্য দায়বদ্ধতা ও নিবেদিত ছিলেন।

রাজার সঙ্গে আমার ছিল আত্মিক সম্পর্ক। মং রাজা পরিবারের এ তথ্য ও তিনি নিজেই লিখে দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল মং রাজন্যবর্গদের নিয়ে পূনাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করার। জ্ঞান গড়িমার দীনতা হীনতার সত্ত্বেও আমি ও কথা দিয়েছিলাম এ মহৎ কাজে সহযোগিতা দেব বলে। কিন্তু তাঁর অকাল প্রয়াণে কোথায় যেন থেমে গেলাম আমরা। রাজার এ মৃত্যুতে শোকে বিহবল প্রজা সাধারণ।

যার মহান সৃষ্টিশীল কর্ম সাধনায় ও সেবায় পার্বত্যঞ্চলের পাহাড়ী বাঙ্গালীর সমাজ গগণে এসেছে শান্তি এবং উন্নয়নের দূর্ণিবার আকাঙ্কা সেই আশা আকাঙ্কা হঠাৎ করেই নিভে গিয়ে হৃদয়ের প্রান্তরে শুরু হল হা-হা কার। রাজার মৃত্যুই যেন এ অঞ্চলের জনগণের শান্তি ও উন্নয়নের পথে আরেক দুর্গম পদ যাত্রা। এ পদ যাত্রা হয়তো বা কুসুমাতীর্ণ নয় তোমার, আমার সকলের। রাজার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলি প্রনমি, হে রাজ বাহাদুর তোমাকে।

লেখক: একজন নান্দনিক কবি ও লেখক।

অপেক্ষা

মিঠুন কুমার সাহা

যুগে যুগে কৃষ্ণের বাঁশির টানে ছুটে এসেছে রাধিকারা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাঁশি বাজেনা সত্যই এখনোও সেই প্রাণ পাগল করা বাঁশি বাজে ভিন্ন প্রযুক্তিতে পাগল করে আধুনিক রাধিকাদের। জল আনতে যাওয়ার অজুহাতে কৃষ্ণের সাথে দেখা করতে যায় না রাধিকারা এটা সত্যই। কৃষ্ণ প্রেমিক রাধিকাদের কৃষ্ণের দেখা করবার নিয়ম পাল্টে অন্য অজুহাতে দেখা হয়। পায়রার পায়ে চিঠি বেঁধে দেয় না ফরাদ প্রিয়তমা শিরিনকে উদ্দেশ্য করে। এখনকার শিরিন ফরাদের মধ্যেও চিঠি আদান প্রদান করা হয় তবে অপেক্ষার পালা অনেক কম। বর্তমানে প্রেমে রাধা কৃষ্ণ ঠিকই আছে শুধু বদলেছে প্রেমের মাধ্যম। এটাই বর্তমান প্রেমের স্বরূপ।

প্রেমের নদীতে পা ডুবিয়ে বসে আছে এক যুবক প্রভাত। প্রতিক্ষায় আছে প্রেম তরী তার ঘাটে ভিরবে। আশায় আশায় বসে সে প্রেমকে কল্পনা করে চলেছে। অপর দিকে ঢাকাবাসী পনেরো বছরের মেয়ে রাত্রি প্রেমকে কল্পনা করে পুজা করে চলেছে। তার কাছে পৃথিবীর সকল রূপ নতুন। ঠিক যেমনটি বসন্ত এলে গাছের নতুন পাতার মাঝে বসে কোকিল ডাকে। তার মনের মাঝেও শুনতে পাচ্ছে কোকিলের ডাক। এক সময় তার লাল রং কত অপছন্দের ছিল আর এখন কত প্রিয় হয়ে উঠেছে।

ছোট বেলায় সেই অগোছালো সবকিছু গুছিয়ে রাখতে ভালো লাগে **তার**। ছোট বেলার কথা মনে এলে লজ্জায় লাল হয়ে যাবে সে। ছোট বেলায় সে কখনো জা**মা পর**ত না সব সময় খালি গায়ে থাকত আর সে বর্তমানে জামার নিচে আবৃত রাখে তার **শরীর**কে। সব কিছুর কত পরিবর্তন তার মধ্যে সে ভেবেই অবাক হয়ে যায়। তার মনে সব সময় প্রেম উতলা হয়ে ওঠে ইচ্ছা করে কৃষ্ণের সাক্ষাত পেতে। প্রকৃতির নিয়মেই তার মধ্যে বয়ে চলেছে প্রেম ধারা। মোবাইলে হঠাৎ একটা মিসকল। কোন উত্তর না। এরপর কল্ এলো। **হ্যালো** কে? চুপ করে রইল রাত্রি। প্রভাতের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। অলক **বলল** প্লিজ **কথা** বলেন। আচ্ছা আপনি কি কথা বলতে পারেন না? তাহলে আমি বলি **আপনি** শুধু আমার শ্রোতা, ব্যাস এই কথা বলা শেষ হতে সুন্দর একটা মায়াবী হাসি শুনতে **পেল প্র**ভাত। **ব্যাস** বুলেছি আপনি একটা মেয়ে। নাম কি হে কন্যা? কারো হাসি কি এমন **সুন্দর হয়?** আপনার নামটা কি জানতে পারি? কোন উত্তর নেই। হ্যাঁ আপনাকেই বলছি। রাত্রি; বা খুব সুন্দর নাম আপনার। আপনার নাম কি? প্রভাত, আপনি কি করেন? আমি ইষ্টাম ফোর্ডে বি বি এ ২য় বর্ষতে আছি। আর আপনি? আমি এবার এস এস সি পরীক্ষার্থী ভিকারুননেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে আছি। ও ভাল বলল অলোক। আমি কি আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে পারি? জবাবে রাত্রি; ভেবে দেখব। কথা শুনে প্রভাত হতাস হয়ে গেল তার স্বন্নই বুঝি মিছে না হয়ে যায়। প্রভাত ও রাত্রি কিছুগণ চুপ করে রইল। হঠাৎ সেই মায়াবী হাসি, হাসছেন যে? আমি মজা করছিলাম হ্যাঁ বন্ধুত্ব করতে পারেন। আপনার এই নাম্বারে কি সব সময় পাওয়া যাবে? উত্তরে রাত্রি হ্যাঁ, তাহলে আজ রাখি কাল কথা হবে। দুই জনের স্বপ্নই এক হয়ে গেল। প্রভাত যা ভাবছে রাত্রিও তাই। দিন যায় রাত যায় তাদের কথা কুয়ায় না ব্যাচ এক পর্যায়ে বন্ধুত্ব থেকে প্রেম। দুইজনই মোবাইল সব সময় সাথে রাখে। একদিন প্রভাত অনেক সময় ধরে কোন ফোন করছে না রাত্রি ও মোবাইলের একাউন্ট ব্যালেন্স শূন্য। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা মোবাইল বেজে উঠল। এ যেন কৃষ্ণের বাঁশির ধানে যেমন রাধিকারা ছুটে আসে তেমনই দশা তার। হ্যালো

জাতিসত্তার বিচারেও তারা তামিল। ১৯৫৬-র সংবিধানে শুধুমাত্র সিনহালাকে বিচারেও তারা তামিল। ১৯৫৬-র সংবিধানে শুধুমাত্র সিনহালাকে রাষ্ট্রভাষা করা হলো। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রাবল্যভিত্তিক গণতন্ত্র (majoritarian) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; বিপরীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী তামিলদের ভাষা হয়েছিল উপেক্ষিত। আর এই সিদ্ধান্তই ছিল তামিল বিদ্রোহের বীজ, যা থেকে এলটিটিই'র মতো মহীরূহের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে।

ভারতের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক– ১৯৬১ সালে আসামে বরাক উপত্যকায় ভাষার দাবিতে আমাদের মতো রক্ত ঝরেছিল। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে ভারতে ভাষার রাজনীতিতে বহিঃপ্রকাশ ছিল অন্যরকম। স্বাধীনতার পর রাজ্যগুলোর যে প্রশাসনিক সাযুজ্যপূর্ণ ছিল না। যেমন মাদ্রাজ রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তামিল, তেলেগু, কানাড়া এবং মালয়ালাম ভাষার মানুষ। তেলেগুভাষী মানুষ সর্বপ্রথম ভাষার রাজনীতির সূচনা করে। ১৯৫৩-তে নেহেরুর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা সম্পূর্ণ তেলেগুভাষী রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশ অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারত সরকার একটি রাজ্য সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশন (States Reorganizations Commission) নিয়োগ করে। ১৯৬৫-তে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যসমূহের সীনা ভাষার ভিত্তিতে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়।

রাজ্যঃ মাদ্রাজ, কেরালা, মহীশুর, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র;

ভাষাঃ তামিল, মালায়ালাম, কানাড়া, গুজরাতি এবং মারাঠি

১৯৬০-এ পাঞ্জাব বিভক্ত হলো দুটো রাজ্যে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা। পাঞ্জাব হলো পাঞ্জাবিভাষিদের রাজ্য; আর হরিয়ানায় থাকলো হিন্দিভাষী।

অবশ্য অভিন্ন ভাষা (Lingua franca) হলো হিন্দি, অর্থাৎ যে সিদ্ধান্ত ১৮৬৭-তে বেনারসে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু একই সঙ্গে সংবিধানে ভারতের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেল পনেরোটি ভাষা; ১) অসমি, ২) বাংলা, ৩) গুজরাতি, ৪) হিন্দি, ৫) কানাড়া, ৬) কাশ্মিরি, ৭) মালয়ালায়, ৮) মারাঠি, ৯) উড়িয়া, ১০) পাঞ্জাবি, ১১) সিন্ধি, ১২) তামিল, ১৩) তেলেগু, ১৪) সংস্কৃত এবং ১৫) উর্দু।

জাতিসংঘ নির্ধারিত অনেক দিবস আছে, যা বছরের বিভিন্ন তারিখে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ উদ্‌যাপন করে। এমনি একটি হলো ২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, যার উৎস বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ-এশিয়া।

"চুক্তি-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি "

অনুরাগ চাকমা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বরাবরই উত্তপ্ত, অশান্ত আছে। এ যাবৎ এই অঞ্চলে ডজন ডজন গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। শত-শত মা-বোন ধর্ষনের শিকার হয়েছে। শত-শত পাহাড়ী আদিবাসী পরিবার নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। হাজার হাজার বাড়ি-ঘর ভস্মীভূত হয়েছে। অনেক পাহাড়ী গ্রেফতার হয়েছে। অনেক ছাত্র-যুবক নির্যাতিত হয়েছে। এসব মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা পরিকল্পিতভাবে ঘটে চলেছে। চুক্তি-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার অবস্থাকে বিশ্লেষণ করার আগে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় কথা বলে রাখি। বাংলাদেশ রাষ্ট্র অভ্যুদয়ের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার জন্ম হয়। পাহাড়ীরা আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন দাবিতে দীর্ঘ তিন যুগের বেশি ধরে নিরবিচ্ছিন্ন আপসহীন লড়ায়-সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। আর অপরদিকে সাম্প্রদায়িক এই রাষ্ট্রযন্ত্র এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর অস্থিত্বকে নিঃশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্রের খেলায় মেতে উঠে। একই ভূখন্ডের উপর পাহাড়ী ও শান্তিবাহিনী বনাম সেটেলার বাঙ্গালী, সেনাবাহিনী ও সরকার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। শুরু হয় এক পক্ষ অপর পক্ষকে হামলা করার মধ্য দিয়ে ধ্বংসের ভয়ংকর খেলা। ৯৭' আগ পর্যন্ত এখানে বৃষ্টি ধারার মত রক্ত ঝরে। রিক্ত শীতের গাছের ঢালাপালা থেকে পাতা খসে পড়ার মত মানুষের জীবন ঝরে। অবশেষে ৯৭' সালে সরকার ও পিসিজেএসএসের মধ্যে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। অবসান ঘটে পাহাড়ী জনগণের সশস্ত্র লড়ায়ের জীবন। দুই হাজারের মত গেরিলা অস্ত্র সর্ম্পনের মধ্য দিয়ে স্বভাবিক জীবনে ফিরে আসে। ৬৪, ৬০৯ জন শরণার্থী ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক ভারতের ত্রিপুরা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। ধীরে ধীরে শুরু হতে থাকে শান্তি প্রক্রিয়ার পদযাত্রা। দীর্ঘ দুই যুগের বেশি পাহাড়ী-বাঙ্গালী মধ্যেকার যে শক্রতা, অবিশ্বাস ও সন্দেহ ছিল তা ধীরে ধীরে শিথিল হতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্ত রূপ নিতে থাকে। যেন অনেকদিনের মুমূর্ষ রোগী বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। কিন্ত এই ভয়ংকর ব্যাধি থেকে শেষ পর্যন্ত তার মুক্তি মিলল না। তাকে শুধু এখন অক্সিজেনের সাহায্যে বেঁচে রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা... ঠিক এই মুমূর্ষ রোগীর মত। কারণ এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। যেখানে টান্‌টান্‌ উত্তেজনা বিরাজ করছে। সেখানকার মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক এবং উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়ে গেছে। চুক্তি সম্পদিত হওয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে একের পর এক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে চলেছে। আর আমি এ বিষয়টিকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে একটা ছোট-খাট বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে চেষ্টা করব। আমি এ বিষয়টি আলোচনা করতে কয়েকটি মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রকে বেছে নিয়েছি। যদিও আলোচনা অনেক কিছু বাকী থাকার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। সেই ত্রেগুলো হল ঃ-

(ক) জুম্ম জনগণের উপর সেটেলার বাঙ্গালীদের বর্বরোচিত আক্রমন;,
(খ) জুম্ম নারী ধর্ষণ ; (গ) ভূমি দখল ; (ঘ) ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেফতার ও নির্যাতন ;
(ঙ) পরিকল্পিত হত্যা ; এবং (চ) ধর্মীয় স্বধীনতায় হস্তপে।

(ক) জুম্ম জনগণের উপর সেটেলার বাঙ্গালীদের বর্বরোচিত আক্রমন ঃ ৯৭' সলে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হলে আমরা আশা করেছিলাম পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের গাঁ আর নরপিশাদের ধারালো থাবায় রক্তাক্ত হবে না। কেউ আর নিজের আপন জনকে হারাবে না আর। আমাদের অধিকার নিয়ে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারবো বলে আমরা সবাই স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্ত

সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়ে ধরা দিল। চুক্তি উত্তর বর্তমান সময়ে জুম্ম জনগণ অতীতের মত ঘাতক সেটেলার বাঙ্গালীদের জঘন্য আক্রমনের শিকার হচ্ছে। তাই চুক্তি উত্তর ১১টি বছরে ৯টি বড় ধরণের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাসহ অনেক ছোট-খাট ঘটনা ঘটেছে। নিচের "ছক" এসব ঘটনাগুলো তুলে ধরা হল ঃ-

ক্রমিক নং	তারিখ ও সন	সম্প্রদায়িক হামলা
১	৪ এপ্রিল/১৯৯১	বাঘাইহাট হামলা
২	১৬ অক্টোবর/১৯৯৯	বাবুছড়া হামলা
৩	১৮ মে/২০০১	বোয়ালখালী-মেরুং হামলা
৪	২৫ জুন/২০০১	রামগড় হামলা
৫	১০ অক্টোবর/২০০২	রক্যভিলা হামলা
৬	১৯ এপ্রিল/২০০৩	ভূয়াছড়ি হামলা
৭	২৬ আগষ্ট/২০০৩	মহালছড়ি হামলা
৮	৩ এপ্রিল/২০০৬	মাইসছড়ি হামলা
৯	২০ এপ্রিল/২০০৮	সাজেক হামলা

(খ) জুম্ম নারী ধর্ষণ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার মধ্যে নারী ধর্ষণ একটি। দেখা গেছে প্রতিটি সাম্প্রদায়িক হামলায় পার্বত্য সমাজের একটি বৃহত্তর অংশ এই নারী সমাজের সদস্যরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৯৯-এর বাবুছড়া হামলায় ১ জন, ২০০৩-এর মহালছড়ি হামলায় ১০ জন ও ২০০৬-এর মাইসছড়ি হামলায় ৪ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়। এছাড়া ও কত ছাত্রী পুলিশ, সেনাসদস্য ও সেটেলার বাঙ্গালীদের ধর্ষণের শিকার হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, আদিবাসী নারীকে এখনো এ সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের মানবসত্তা হিসিবে বিবেচনা করা হয় না। তাকে সব সময় ভোগ্য পণ্য হিসিবে বিবেচনা করা হয় না। তাকে সব সময় ভোগ্য পণ্য হিসিবে দেখা হয়। তাই তাদের উপর ঐসব জন্তুজানোয়াররা রাষ্ট্রের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে নির্যাতন করে যাচ্ছে। সবচেয়ে অবাক হওয়ার বিষয়, দেশে সরকার আছে, বিচারবিভাগ আছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আছে অথচ এমন গর্হিত অপরাধাদেরকে ধরা হচ্ছে না, তাদের বিচার হচ্ছে না। তারা সাত খুন করে ও পার পেয়ে যাচ্ছে। দেশ কত সভ্য! সমাজ কত শিতি! মানুষের বিবেক কত সচেতন ও মনুষ্যত্বে গড়া তা কিছুটা হলে ও উপলব্ধি করা যায়।

(গ) ভূমি দখল ঃ মানবাধিকার ঘোষণার ১৭ (খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "কাউকে তার সম্পতি থেকে খেয়ালখুশীমত বঞ্চিত করা যাবে না।" অথচ বাংলাদেশের এক দশমাংশ জায়গা জুড়ে যে পাহাড়ী জনপদ, সেই পাহাড়ের পাহাড়ীরা এখনো এই অধকার থেকে বঞ্চিত। তারা প্রতিদিন নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার আতংক নিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। প্রতিনিয়ত উচ্ছেদ হচ্ছে, উচ্ছেদ হয়েছে শতশত পরিবার। ১৯৯৭ সালের ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক ভারতের ত্রিপুরা থেকে ১২,২২২ টি শরণার্থী পরিবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু তাদের মধ্যে -

বাস্তুভিটা ফেরত পায়নি	১,৩৩৯ পরিবার
বাগানভিটা ফেরত পায়নি	৭৭৪ পরিবার
ধান্যজমি ফেরত পায়নি	৯৪২ পরিবার
মোট জমি-জমা ফেরত পায়নি	৩,০৫৫ পরিবার

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পরও এদের শরণার্থী জীবনের দুঃখ-দুদর্শার মোচন হয়নি। সেই শরণার্থী সেই শরণার্থী রয়ে গেছে। এরা এখনো নিজ জায়গাজমিতে ফিরে যেতে পারেনি। এসব

ছিন্নমূল মানুষেরা অমানবিকভাবে জীবন-যাপন করছে। এদের দুঃখ বুঝি উপলদ্ধি করার এদেশে-কেউ নেই?

এছাড়াও চুক্তি বিভিন্ন সময়ে অনেক পাহাড়ী মানুষের জায়গা-জমি সেটেলার বাঙ্গালীদের দখলে চলে গেছে। এ প্রসঙ্গে "ভ্যানগার্ড অক্টোবর/২০০৭ সংখ্যায়" আসা প্রতিবেদনটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে তিন পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলার মধ্যে ১৩টিতে সমস্যা জিইয়ে আছে বলে তুলে ধরা হয়। খাগড়াছড়ির দীঘিনালা-বাবুছড়া, মাটিরাঙ্গা, পানছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, রামগড়সহ বিভিন্ন জায়গায় সেটেলার বঙ্গালী পুর্নবাসন প্রক্রিয়া নতুন করে চালু বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও, জুরুরী অবস্থার সময় আগষ্ট/২০০৭ সালে দীঘিনালা বাবুছড়া ইউনিয়নের চারটি মৌজায় ৮১২টি বাঙ্গালী পরিবারকে পুর্নবাসন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে তথ্য দেয়া হয়। নিচের "ছকে" এসব তথ্য তুলে ধরা হল ঃ-

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	পরিবারের সংখ্যা
১	বাঘাইছড়ি মৌজা	৩৯৩ টি
২	দীঘিনালা মৌজা	২২৮ টি
৩	নুনছড়ি মৌজা	৯৩ টি
৪	জারুলছড়ি মৌজা	১৩ টি

এছাড়াও, সরকার সেনাবাহিনী গ্যারিসন স্থাপন, আর্টিলারী প্রশিণ কেন্দ্র স্থাপন, বিমানবাহিনী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, জোন সম্প্রসারণ ও বনায়নের নামে জুম্মদের হাজার হাজার একর জায়গা-জমি অধিগ্রহণ করে চলেছে। যার ফলে শত-শত পাহাড়ী আদিবাসী পরিবার অস্থিত্বহীনতার সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। নিচের ছকে এসব তথ্যাবলী উল্লেখ করা হল ঃ-

ক্রমিক নং	জমি অধিগ্রহনের ঘটনার বিবরণী	জায়গার পরিমাণ
১	রুমা সেনাবাহিনী গ্যারিসন স্থাপনের জন্য	৯,৫৬০ একর
২	বান্দরবান সদর বিগ্রেড সম্প্রসারনের নামে	১৮৩ একর
৩	বান্দরবান আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে	৩০,০০০ একর
৪	বান্দরবান বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে	২৬,০০০ একর
৫	লংগদু জোন সম্প্রসারনের নামে	৫০ একর
৬	পানছড়ি জোন সম্প্রসারনের নামে	১৪৩ একর
৭	বনায়নের নামে	২১৮,০০০ একর

(ঘ) ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেফতার ও নির্যাতন ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো সরকার পাহাড়ীদেরকে খেয়াল খুশীমত গ্রেফতার করে নির্যাতন করে চলছে। চুক্তি-উত্তর আওয়ামী লীগ ও জোট সরকারের বিগত দুঃশাসনামলে অসংখ্য পাহাড়ী কে গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলায় শাস্তি দিয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। যা মানবাধিকারের স্পষ্ট লংঘন। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনার ৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি ভোগে বাধ্য করা চলবে না।" এছাড়া ও ধারা-৯-এ স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, "কাউকে খেয়ালখুশীমত পাহাড়ীদের এসব মানবাধিকার ন্যাক্করজনকভাবে লংঘন করে চলেছে। যা সত্যিই দুঃখজনক। এক্ষেত্রে আমি কতিপয় উদাহাণের অবতারনা কারছি। গত ২৫মে/২০০৪ সালে খাগড়াছড়ি গুইমারা এলাকা থেকে নিরাপত্তাবাহিনী ১৭ জনকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার ও রাতদিন অমানুষিক নির্যাতন চালায়। ২৩ আগষ্ট/২০০৪ সালে জিম্পু চাকমা নামে একজন নিরীহ ছাত্রকে মাটিরাঙ্গা সেনা জোনে নির্যাতন করা হয়। ১৫ নভেম্বর/২০০৫ সালে পানছড়ি উপজেলা থেকে সুশীল চাকমা সোহেলকে নিরাপত্তাবাহিনী ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রেপ্তার করে। ১৪ জুন/০৬

সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী বাঙ্গালী পরিষদের ১৮ জন নেতাকে রাঙ্গামাটি সেনাজোনে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। সর্বশেষ জরুরী অবস্থার সময় সত্যবীর দেওয়ান, রাংলাই ম্রো সহ অনেককে উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলায় সাজা দেয়া হয়। এভাবে একের পর এক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে চলেছে।

(ঙ) হত্যা ঃ পাহাড়ীরা এখনো নিজের গ্রামে, নিজের বাড়িতে নিরাপদ নয়। মৃত্যু তাদের সর্বদা পিছু পিছু লড়ছে। তাই মৃত্যু এদের জীবনসঙ্গী। সুন্দর একটি সকাল দিয়ে শুরু হওয়া প্রতিদিন পাহাড়ী পল্লীতে মৃত্যুর সর্বনাশা আতংক বিরাজ করছে। রাত ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে জীবনের মৃত্যুভয় এদেরকে ঘিরে ধরে। এরা প্রতিটি রজনী কাটায় উদ্বেগে-আশংকায়। সত্যই এদের জীবনের দখল নিজেদের কাছে নেই। এরা এই উগ্রজাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের কাছে চরম অসহায়। এরা এই অগ্রণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তন্ত্র থেকে জীবনের নিরাপত্তা পায় না। বরং রাষ্ট্রেই এদের জীবনের নিরাপত্তার হুমকি। তাই দেশের এই অঞ্চলে এখনো রক্তপিপাসু ঘাতকদের নরহত্যার নীরব উৎসব চলছে। ১৯৯৯ সালের বাবুছড়া হামলায় ৩ জন ও ২০০৩ সালের মহালছড়ি হামলায় ২ জন সর্বশেষ লাদুমনি চাকমার হত্যাকান্ডসহ চুক্তি-উত্তর বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অসংখ্য পাহাড়ীকে জঘন্যভাবে হত্যা করা হয়েছে। আর এভাবে কত পাহাড়ী মানুষের জীবন নীরবে খসে পড়বে? এই জবাব আমরা রাষ্ট্রের কাছে চায়।

(চ) ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ঃ ১৯৪৮ সলের ১০ ডিসেম্বর যে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র গৃহীত ও জারি করা হয়, সেখানে ১৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে "প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা রয়েছে।" কিন্তু পাহাড়ীরা এই মানবাধিকার থেকে এখনো বঞ্চিত। রাষ্ট্রযন্ত্র এই মানবাধিকারটি ধারাবাহিকভাবে লংঘন করে চলেছে। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও একদিকে ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। অন্যদিকে আশংকাজনকভাবে বিভিন্ন হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর উপর হামলা করা হচ্ছে। যা সত্যিই আমাদেরকে না ভাবিয়ে পারে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরতে পারি। যেমন-বরকল উপজেলার ফাটিটাঙ্যা চুগ ভাবনা কেন্দ্র ও বাঘাইছড়ি বাগানবাড়ি (চার মাইল এলাকা) নির্মানাধীন বৌদ্ধ মন্দিরের জায়গায় বিডিআর ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। দীঘিনালা বোয়ালখালী অনাথ আশ্রম ও মহালছড়ি বৌদ্ধ শিশুঘর অনাথ আশ্রমের জায়গায় জোর-জবর দখল করে সেটেলার বাঙ্গালী বসতি স্থাপন করা হয়েছে। এতসব ঘটনায় প্রশাসন নিশ্চুপ কেন? কেন আজো আমাকে প্রশাসনের এমন নিন্দিত ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করতে হচ্ছে ?

মোটকথা, চুক্তির পরেও পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী জনগণের মৌলিক অধিকার চরমভাবে লংঘিত হচ্ছে। কতদিন চলবে পাহাড়ী মানুষের উপর এই নির্যাতন নিপীড়ন ? আর কতদিন এই পবিত্র ভূখন্ডে রক্ত ঝরবে ? আর কতদিন স্বজন হারানোর বেদনা আমাদের বয়তে হবে? ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিজয়ী মহাজোট সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিন বদলের স্বপ্ন কি আমাদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারে? তার কতটুকু প্রত্যাশা করতে পারি?

তথ্যসূত্র ঃ

১। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ; ২ ডিসেম্বর ২০০২ ; ২০০৩; ২০০৫; ২০০৬; ২০০৮; পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।
৬। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ঃ শাসকগোষ্ঠীর নীতি ও নাগরিক সমাজের ভূমিক ; মঙ্গলকুমার চাকমা; সংহতি ২০০৫।
৭। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপন্ন আদিবাসী এবং বিপন্ন মানবতা ; এস এস চাকমা ; মাওরুম, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০০৫।
৮। ভ্যানগার্ড, অক্টোবর ২০০৭ সংখ্যা।
৯। আমাদের অধিকার, নামক পুস্তিকা।

* ছাত্র-শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উচ্চ শিক্ষায় তনচংগ্যাদের অবস্থান

জ্যোতি বিকাশ তনচংগ্যা

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে যে কোন জাতির উন্নতি নির্ভর করে প্রযুক্তি এবং শিক্ষায় কতটুকু শিক্ষিত তার উপর। শিক্ষা এবং প্রযুক্তি রাষ্ট্রের মূল জনগোষ্ঠী তথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের জন্য খুবই কষ্টকর।

বাংলাদেশ মত উন্নয়নশীল দেশে বসবাসকারী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এটা প্রযোজ্য। এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তনচংগ্যা অন্যতম। বাংলাদেশে পার্বত্য রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ এবং চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় তনচংগ্যাদের বসবাস। তনচংগ্যারা শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। জনসংখ্যা প্রায় অর্ধলক্ষ হলেও শিক্ষার অবস্থা শোচনীয়। ২০০৮ সাল পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তনচংগ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা মোট ২৬ জন:

ক্রঃ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংখ্যা
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২ জন
২	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৩ জন
৩	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১৭ জন
৪	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	১ জন
৫	সিলেট মেডিকেল কলেজ	১ জন
৬	সিলেট ভেটেরিন্যারি কলেজ	১ জন
৭	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১ জন

উপরের সারণী হতে বোঝা যায় তনচংগ্যাদের জনসংখ্যা অনুপাতে উচ্চ শিক্ষার কি অবস্থা। একজন তনচংগ্যা ছাত্র/ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা আমি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া একজন তনচংগ্যা ছাত্রের অভিজ্ঞতা তুলে ধরলাম: 'ক' দেশে একটি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত। বাবা একজন কৃষক। বাবা অনেক কষ্ট করে ছেলের জন্য মাসের শুরুতে টাকা পাঠান। 'ক' অনেক হিসেবে করে মাসটি অতিক্রম করে। অনেক ক্ষেত্রে মাসটি চলার জন্য তাকে সকালের নাস্তা বাদ দিতে হয়। এছাড়া বিকেলের নাস্তা বন্ধুদের উপর নির্ভর করতে হয়। 'ক' অনেক নিকট আত্মীয় চাকরী করেন। আত্মীয়রা 'ক' কে আর্থিকভাবে সহযোগীতা করেন না। তাদের ভয় 'ক' যদি পরবর্তীতে তাদের চেয়ে বড় চাকরী করে! তাই যে কোন প্রকারে হোক 'ক' এর পড়ালেখা বন্ধ করতে হবে। এ লক্ষ্যে 'ক' আত্মীয়রা 'ক' কে আর্থিক উর্পাজনের জন্য চাকরী করার পরামর্শ দেন, কারণ একটাই 'ক'-এর বাবা উর্পাজনে অক্ষম হয়ে পড়ছে। কিন্তু 'ক' জানে সরকারী চাকরী এখন নেয়ার অর্থ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা বন্ধ হওয়া। তাই সে শত কষ্টতার মাঝেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেয়ার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প কারণ সে জানে এ ডিগ্রি নেয়ার মাধ্যমেই সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। আর তই 'ক' শত আর্থিক সমস্যার মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন অতিক্রান্ত করছে...।

উপরে উল্লেখিত কাহিনীটি হচ্ছে– একজন তনচংগ্যা ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার চলমান চিত্র। তনচংগ্যা ছাত্র/ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় বলে আমি মনে করি:

১) রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি: রাষ্ট্রীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তনচংগ্যাদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট এক বাধা। রাষ্ট্র সব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমান সুবিধা দেয় না। সেসব জনগোষ্ঠী দূর্বল তারা কম সুবিধা পায়। তনচংগ্যারা অন্যান্যদের চাইতে দূর্বল বিধায় রাষ্ট্রের নিকট হতে কম দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

২) ভাষাগত সমস্যা: প্রাথমিক শিক্ষা নিজ মাতৃভাষা প্রচলন না হওয়াতে শিশুকালেই এক সঙ্গে নিজ মাতৃভাষা এবং বাংলা ভাষা শিখতে হয় ফলে কোন বিশেষ ভাষার উপর তারা দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। যেটি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।

৩) অর্থনৈতিক সমস্যা: তন্‌চংগ্যাদের অধিকাংশ পরিবার জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান সময়ে জুম চাষ করে সন্তানদেরকে উচ্চ শিক্ষা পড়ানো এ স্বপ্নের ব্যাপার। যেখানে অন্যান্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী অধিকাংশ চাকরীর উপর নির্ভরশীল সেখানে তন্‌চংগ্যাদের অর্থনৈতিক কারণে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে না।

৪) আবাসন সমস্যা: পার্বত্য জেলাগুলো সদর হতে বসতবাড়ি দূরে হওয়ার নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস করা সম্ভব অধিকাংশের হয় না। এছাড়া শহরের মধ্যে কোন স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা না থাকায় তন্‌চংগ্যাদের পক্ষে ঘর ভাড়া করে থাকা সম্ভব হয়ে উঠে না। যেখানে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ছাত্রদের থাকার জন্য স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। একটা ছাত্রাবাস থাকলেও তা সদর থেকে দূরবর্তী জায়গায় অবস্থিত।

৫) সুশীল সমাজের বিমুখতা: তন্‌চংগ্যা সমাজে সুশীল সমাজ গরীব মেধাবী ছাত্রদের পড়াশোনার জন্য আর্থিক সহযোগীতা প্রদান হতে দূরে থাকে। আমরা দেখি অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সুশীল সমাজ বাৎসরিক আর্থিক সহযোগীতা করে থাকে। ফলে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ছাত্র/ছাত্রীরা তন্‌চংগ্যাদের তুলনায় বেশ এগিয়ে রয়েছে।

৬) এনজিওদের অসহযোগীতা: তন্‌চংগ্যা জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করছে সেরকম কোন এনজিও নেই। আমরা দেখি পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু এনজিও জনভিত্তিক গড়ে উঠেছে। কিন্তু তন্‌চংগ্যারা অনেক ক্ষেত্রে সহযোগীতা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

৭) পিতা-মাতাদের শিক্ষার অভাব : তন্‌চংগ্যারা জুম চাষ এবং কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত বিধায় নিজ সন্তানদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হন।

উচ্চ শিক্ষায় যেসব অসুবিধা রয়েছে সেগুলো দূর করার জন্য নিম্নক্ত প্রদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে :

১) রাষ্ট্রের নিকট দৃষ্টি আকর্ষণ করা : রাষ্ট্রের নিকট তন্‌চংগ্যা বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা যাতে করে রাষ্ট্র সমস্যা সর্ম্পকে অবগত হয়।

২) তন্‌চংগ্যাদের যারা সরকারী/বেসরকারী চাকরী ও ব্যবসা করে সবার যৌথ উদ্যোগে মাসিক নির্দিষ্ট পরিমান টাকা দিয়ে সমিতি গঠন করা। ঐসব সমিতি হতে গরীব মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে নিশর্ত/শর্তভাবে মাসিক কিস্তিতে অর্থ প্রদান করা যেতে পারে।

৩) হোস্টেল নির্মাণ : তন্‌চংগ্যা ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বাংলাদেশ তন্‌চংগ্যা কল্যাণ সংস্থা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান শহরের কেন্দ্রস্থলে ছাত্রবাস নির্মাণ করতে পারে। বর্তমানে যে কয়েকটা ছাত্রবাস আছে তা অবস্থানগত কারণে ছাত্রদের সেখানে থাকা সম্ভব নয়।

৪) সমাজে আর্থিক সচ্ছলদের এগিয়ে আসা : সমাজে অনেক ব্যক্তি আছে যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল তারা গরীব ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করতে পারে। এভাবে সহযোগীতা করলে তন্‌চংগ্যাদের মধ্য শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

তন্‌চংগ্যা ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে শিক্ষা এবং প্রযুক্তির দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আমরা উন্নয়নের প্রবৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হব। এলক্ষে সমাজের সুশীল সমাজ এবং অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যৌথ উদ্যোগে আশু আমাদের করণীয় ঠিক করতে হবে। আমরা কি নিজেদের অস্তিত্ব বিসর্জন দেব নাকি নিজেদের অস্তিত্ব বিকশিত করব!

লেখক: ছাত্র, ঢা. বি. juoti_cht@yahoo.com

মাতৃতান্ত্রিক গারো জাতিসত্তা

ড. মুস্তাফা মজিদ

বাংলাদেশে দু'টি মাতৃতান্ত্রিক জাতিসত্তা রয়েছে। একটি গারো, অপরটি খাসিয়া। বাংলাদেশের গারোরা সংখ্যালঘিষ্ঠ আদিবাসী হিসেবে সংখ্যায় সর্বাধিক। এরা ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, ধোবাউরা, নেত্রকোনার সুসং দুর্গাপুর, জামালপুরের শ্রীবর্দী, শেরপুরের নালিতাবাড়ি ও ঝিনাইগাতি, টাঙ্গাইলের মধুপুর এবং সিলেটের সুনামগঞ্জের ধরমপাশা, তাহেরপুর ও বিশ্বম্বরপুর উপজেলায় বসবাস করছে। এছাড়াও ব"হত্তর ঢাকা'র ধামরাই ও সাভার এবং জয়দেবপুরের শ্রীপুর ও কালিয়াকৈরে গারোদের বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে দেখা যায়। গারোরা নিজেদের মান্দি (মানুষ) বা আচ্ছিক (পাহাড়ি) বলে অভিহিত করে। এছাড়াও ভারতের মেঘালয় রাজ্য, আসামের প্রায় সব জেলাতে, পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে গারো জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। মূলত বাংলাদেশের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি গারো ভারতে বসবাস করে।

কর্ণেল ডালটনের ভাষায় গারো জাতিগোষ্ঠী মহামানবগোষ্ঠীভুক্ত মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর বোড়ো সম্প্রদায়ভুক্ত দলের একটি শাখা। গারোদের চেহারা অনেকটা পূর্ব-ভারতের নাগাল্যান্ডের নাগা, মেঘালয়ের খাসিয়া ও মনিপুরের মনিপুরীদের মতো। নৃতাত্ত্বিক ডঃ হাটন তাদের গায়ে লোম কম ও দাঁড়ি-গোঁফ বিশেষ গজায় না, তাদের নাক চেপ্টা, ভুরুন্ন ভারী ও গায়ের রং ফরসা বলে উলেস্নখ করেছেন। ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে বুখানন হ্যামিলটন এদের চীনাদের মতো দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, খর্বকায় ও কর্মঠ মানুষ বলে বর্ণনা করেছেন।[১]

গারোদেরকে স্থানীয় ভাষায় মান্দি বলে অভিহিত করা হয়। কথিত আছে ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজধানী মান্দালয় নামক স্থানে যাযাবর জাতি হিসেবে পরিচিত গারোদের পূর্বপুরুষদের বসবাস ছিল বিধায় তারা মান্দালয়ের অভিবাসী বলেই তাদেরকে মান্দি বলা হয়ে থাকে। তবে গারোদের আদি নিবাস ভারতের আসাম রাজ্যের কামরূপ জেলা বলেই ধরে নেয়া হয়। অবশ্য কারো কারো মতে গারোদের এই উপমহাদেশে আগমনের আগে তিব্বতের গারু নামক এলাকায় এদের জনবসতি ছিল। এবং এই গারু থেকেই গারো শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে তাদের কারো কারো বিশ্বাস। তবে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ, উপকথা ইত্যাদিতে গারোদেরকে কিরাত জাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতের যুগে গারো জাতি ও অন্যান্য মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় গারোরা 'কিরাত' জাতি বলে আখ্যায়িত ছিল। রামায়ণেও গারোদের কিরাত জাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রামায়ণের কিষ্কান্ধ্যা কান্ডে সীতার অন্বেষণে পূর্ব দিকে যে সৈন্যদল প্রেরণ করা হয়েছে সেখানে কিরাতের বর্ণনা রয়েছে। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হলে সম্মুখে যে গারো পাহাড় পড়ে এটাই গারোদের আবাস ভূমি। গারো পাহাড়ের নামকরণের সাথে গারো জাতির সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, গারো পাহাড়ের পাদদেশ বাংলাদেশ এবং ভারতের মেঘালয় ও আসামের যে বিস্তৃর্ণভূমি এখানেই মূলত গারো আদিবাসীদের বর্তমান আবাস ভূমি।

গারোদের আদিম ইতিহাস সম্পর্কে নানা মতভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন তথ্য রয়েছে। প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষপুর ও কামরূপ জেলায় গারোরা আগে বসবাস করত। এই জাতির বিস্তার দক্ষিণে সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে আসাম, অভিভক্ত বাংলা ও উড়িষ্যায় প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষপুরের সাম্রাজ্যের প্রভাব ছিল বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা।

পুনরায় উল্লেখ্য, গারোরা নিজেদের মান্দি (অর্থাৎ মানুষ) বলে। গারোদের মধ্যে যারা পাহাড়ে বসবাস করে তাদের 'আচ্ছিক' বা পাহাড়ি মানুষ বলে। আর যারা সমতলে বাস করে তাদের

'লামদানি' বলে। 'গারো' আদিবাসীদের ভাষা নয়। বাঙালিরাই এদের 'গারো' নামে অভিহিত করে। মেজর পেরু ফেয়ার গারোদের নানা বিভাগের কথা উলেস্নখ করেছেন। যেমন আচ্ছিক, আবেং আতং, দোয়াল, চিবক। এরা সংখ্যায় কম। এছাড়াও রয়েছে মাৎছি, মেগাম, রুগা, আবেং শ্রেণীর সংখ্যালঘু। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে বাবুল নামে অপর একটি শ্রেণী বাস করে।২

গারোদের স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষার নাম 'আচ্ছিক কাথ্যা'। আর কাথ্যা শব্দের অর্থ ভাষা। এই ভাষা গারোদের মৌখিক ভাষা। এর কোনো লিখিত রূপ নেই। বাংলাদেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতির মতোই গারোদের ভাষায় বর্ণমালা নেই। তবে ভারতের গারোরা রোমান হরফে গারো ভাষার ব্যবহার করে। গারোদের মাঝে ব্রহ্মদেশ থেকে এ দেশে আগত পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘন অরণ্যের অধিবাসী ম্রো বা মুরংদের ন্যায় বর্ণমালা নিয়ে একটি কিংবদন্তি বা প্রাচীন কাহিনী রয়েছে। গারোদের বর্ণমালা সম্বন্ধে প্রাচীন এই কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, "প্রাচীন তিব্বতের আর একটি দল ব্রহ্মদেশের মান্দালয় নামক স্থানে এসে বসতি স্থাপন করে। মান্দালয়ের নাম অনুসারেই গারোদের মান্দায়, পরে মান্দি বলা হয়। মান্দালয়ে গারোদের সভ্যতা গড়ে ওঠে। গারোদের তখন নিজস্ব অর তথা তাদের ভাষার লিখিত রূপ ও ইতিহাস ছিল। সেই রকম কিছু প্রমাণপত্র ও ইতিহাস চামড়ার কাগজে (Parchment paper) লেখা ছিল। কিন্তু তাদের যাযাবর জীবন এবং ভয়াবহ খাদ্য বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষের কারণে তারা এগুলো সেদ্ধ করে খেয়ে ফেলে। ফলে, তাদের বর্ণমালা হারিয়ে যায়।" এর সত্যতা অবশ্য কখনোই নির্ণয় করা যায়নি। অন্যদিকে ম্রোদের কিংবদন্তি বা উপকথায় বলা হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তা ম্রোদের জন্য ধর্মগ্রন্থ কলা পাতায় লিখে গো-বাহন দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত গরু তা খেয়ে ফেলে। ফলে, ম্রোদের বর্ণমালা পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখেনি। আর এ জন্যই গো-হত্যা উৎসব ম্রোদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক রবিন্স বার্লিন তাঁর লেখায় মান্দি বা গারোরা কোথা থেকে এসেছে এই প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন যে, "কোনো জাতিগোষ্ঠীর উৎস সম্পর্কে জানতে হলে সেই গোষ্ঠীর ভাষার আদি অবস্থান কি ছিল তা নির্ণয় করতে পারলেই মোটামুটি সেই গোষ্ঠীর অবস্থান ও আগমন সম্পর্কে একটি ধারণা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।" তিনি জানান, "ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর ও পূর্বে সীমান্ত এলাকায় বেশকিছু ভাষার সাথে মান্দি ভাষা দূর সম্পর্কে সম্পর্কিত। আসাম ও বাংলাদেশের পার্বত্যাঞ্চলের বসবাসকারী লোকদের ভাষা, নেপাল, বর্মা ও তিব্বতের বেশির ভাগ ভাষা ও দক্ষিণ চীনের কিছু অংশের লোকদের ভাষা নিয়ে গঠিত হয়েছে এক বিশেষ ভাষাগোষ্ঠী। এই বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীর নাম 'টিবেটো-বার্মান'। এর অন্তর্ভুক্ত ভাষা হচ্ছে টিবেটান ও বার্মিজ এবং সেজন্যই এই ভাষাগোষ্ঠী 'টিবেটো-বার্মান' নামে পরিচিত। টিবেটো-বার্মান ভাষাসমূহের সাথে চীনা ভাষার সম্পর্ক থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, এ ব্যাপারে সঠিক করে কিছু বলা যায় না।

"ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু জ্ঞান আছে দুর্ভাগ্যবশত টিবেটো-বার্মান ভাষাগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তার চেয়ে অনেক কম। তবে ধারণা করা যেতে পারে যে, কয়েক হাজার বছর আগে নিশ্চয়ই এমন কোনো জায়গা ছিল যেখানে টিবেটো-বার্মান ভাষাগোষ্ঠীর পূর্বসূরি কোনো এক সাধারণ ভাষা প্রচলিত ছিল। আরও ধরে নেয়া যায় যে আধুনিককালে টিবেটো-বার্মান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাসমূহের যে রূপ বিস্তৃতি ও বিভিন্নতা তাও নানা উপরিভাগে বিভক্তি হয়েছে। সেই আদি ভাষা ঠিক কোথায় প্রচলিত ছিল তা আমাদের জানা নেই। তবে তা জানা থাকলেও সেই তথ্য থেকে আধুনিককালের টিবেটো-বার্মান ভাষাগোষ্ঠী কোথা হতে এসেছে তা বলা সম্ভব হত না।

"মান্দি ভাষা টিবোটো-বার্মান ভাষাগোষ্ঠীর বিশেষ একটি উপরিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সামগ্রিকভাবে

গোটা ভাষাগোষ্ঠীর ইতিহাস সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না গেলেও এই বিশেষ উপবিভাগের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। মান্দি, কচ্, রাবা, কাচারী (বা বোড়ো), ছুটিয়া, লালুং এবং টিপুরা ইত্যাদি ভাষাসমূহ টিবোটো-বার্মান ভাষাগোষ্ঠীর যে উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত তার নাম 'বোড়ো'।

এ থেকে একথা স্পষ্ট যে, "কচ্ ও কাচারী এই উভয় ভাষার সাথেই মান্দি বা গারো ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কয়েক শতাব্দী আগে কোনো এক সময় এগুলি একই ভাষা ছিল। সেই সময়ে এই ভাষা শুধুমাত্র বর্তমান গারো হিলস জেলায় ব্যবহৃত হত না, আরও উত্তরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাঞ্চলে, এমনকি পশ্চিম ও দণিে অবস্থিত সমতল ভূমিতেও প্রচলিত ছিল। ঠিক সেই সময়ে অহমিয়া ভাষা ও বাংলা ভাষার পূর্বসূরি ইন্দো-এ্যারিয়ান ভাষা এসব এলাকায় অনুপ্রবেশ করে এবং বোড়ো ভাষাভাষীদেরকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে দেয়।"[২]

তিব্বত ও বর্মা থেকে আগত এই গারোরা মূলত গারো পাহাড়ের পাদদেশে আদিকাল থেকে বসতি স্থাপন করে আসছে। এই পাহাড়টির বিস্তৃত অন্যূন ৩০০০ বর্গমাইল। ভৌগোলিক অবস্থান ১৫০ থেকে ২৬০ উত্তরে, ৪৯০ থেকে ৯৯০ পূর্বে। সীমানা উত্তরে গোয়ালপাড়া, দক্ষিণে জামালপুর ও ময়মনসিংহ, দক্ষিণ-পূর্বে সিলেটের কিয়দংশ, পূর্বে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়। পাহাড়টি উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত। তার অধিকাংশ শিখর দেড় থেকে দু'হাজার ফুট উঁচু। সর্বোচ্চ শিখরের উচ্চতা অনুর্ধ্ব চার হাজার ফুট। উপরের অংশটি কৈলাশ চূড়া। যা গারোদের কাছে পবিত্র বলে গণ্য। যদিও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র তীর্থস্থান যে কৈলাশ পর্বতমালা সেই কৈলাশ এই কৈলাশ নয়। গারোরা দু'ভাগে বাংলাদেশে বসবাস করে। এক ভাগ পাহাড়ের পাদদেশে, যাদেরকে আচ্ছিক অর্থাৎ পাহাড়ি গারো বলা হয়। আর অন্যদিকে যারা সমতল ভূমিতে বসবাস করে তারা সমভূমির লামদানি গারো বলে অভিহিত। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে প্রায় পঞ্চাশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু আদিবাসী রয়েছে। এদের মধ্যে গারোরা অন্যতম প্রধান আদিবাসী জনগোষ্ঠী। বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশের অধিকাংশ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। এবং আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, একমাত্র গারো এবং খাসিয়ারাই হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক। স্মতর্ব্য যে, বাংলাদেশে দুটো মাতৃতান্ত্রিক জনগোষ্ঠী রয়েছে। তার একটি গারো, অন্যটি খাসিয়া। মাতৃতান্ত্রিকতাই গারো সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসান এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উত্থান হলো একটি বিশাল ঐতিহাসিক প্রোপট। "…. যতদিন পর্যন্ত মানুষ শিকার করতে শিখেনি শুধু সংগ্রহের উপর নির্ভর করেছে ততদিন নারীরাই ছিল দলের কর্ত্রী। …. কৃষি কাজ ও পশু পালনের প্রথম অবস্থায় নারীর ভূমিকা ছিল পুরন্নষদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অতএব সমাজে তখন প্রাধান্য ছিল নারীর। কিন্তু চাষাবাদ ও পশু পালন যখন উন্নত হলো তখন এ দুটো এসে পড়ল পুরুষের হাতে। সুতরাং সমাজে আবার পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো। আজকের দিনে পিছিয়ে পড়া কোনো কোনো মানবগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থায় এখনও নারীর প্রাধান্য দেখা যায়।"[৩]

প্রাচীনকালে জনসমাজ গড়ে উঠতো বৈবাহিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। নৃতত্ত্বের জনক হ্যানরি লুইস মর্গান আবিষ্কার করলেন যে, "মাতৃ-অধিকারের ভিত্তিতে সংগঠিত এই গোত্র হচ্ছে আদিরূপ যার থেকে পিতৃ-অধিকার অনুযায়ী সংগঠিত পরবর্তী গোত্রের উৎপত্তি হয়েছে, আমরা প্রাচীনকালের সভ্য জাতিগুলির মধ্যে দেখতে পাই। গ্রীক ও রোমান গোত্র যা সমস্ত পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের কাছে ছিল ধাঁধা, এখন তার ব্যাখ্যা হল ইন্ডিয়ান গোত্র দিয়ে এবং এইভাবে আদি সমাজের সমগ্র ইতিহাসের একটি নতুন ভিত্তি পাওয়া গেল।

"সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে পিতৃ-অধিকার নিয়ে যে গোত্র দেখা যায় তার পূর্ববর্তী স্তরে আদি মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রের আবিষ্কারটি হচ্ছে আদিম সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে ঠিক ততখানি অর্থপূর্ণ যতখানি জৈব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইনের বিবর্তনবাদ অথবা অর্থনীতির ক্ষেত্রে মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। এর সাহায্যে মর্গান এই প্রথম পরিবারের ইতিহাসের একটি রূপরেখা দিতে পারলেন যাতে বিবর্তনের অন্তত চিরায়ত পর্যায়গুলি, বর্তমানে লভ্য তথ্যের ভিত্তিতে যতটা সম্ভব, খসড়াকারে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলো। স্পষ্টতই এতে আদিম সমাজে ইতিহাস পর্যালোচনার নতুন যুগ শুরু হলো। মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রই হয়ে দাঁড়াল সেই খুঁটি যার ওপর এ বিজ্ঞানের ভর; এই আবিষ্কারের পর আমরা বুঝতে পারি কোন্ পথে গবেষণা চালাতে হবে, কোন্ কোন্ অনুসন্ধান করতে হবে এবং কেমন করে অনুসন্ধানের ফলগুলি সাজাতে হবে। ফলে মর্গানের রচনা প্রকাশিত হবার পর এই ক্ষেত্রে অগ্রগতি আগেকার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত ও ভিন্নরূপ।"[৪]

মাতৃতান্ত্রিক গারো সমাজে পরিবারে মেয়েরাই সম্পত্তির মালিক। মায়ের পদবীই ব্যবহার করে ছেলেমেয়েরা। বিয়ের পর ছেলেকে মেয়ের বাড়িতে থাকতে হয় এবং স্ত্রীর সম্পত্তি দেখভাল করতে হয়। মেয়েরা সম্পত্তির মালিক হলেও পরিবার ও সমাজ পরিচালনায় ও শাসনে পুরুষদের সমান অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব বহন করতে হয়। তবে সম্পত্তির মালিকানা একচ্ছত্র স্ত্রীদের। বাংলাদেশে এটি একটি বিরল ঘটনা। মেয়েদের প্রতি গারো সমাজের এই যে আবহমান অধিকার তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

মায়ের দিক থেকে উত্তরাধিকারের এই ধারা যা বিজ্ঞানসম্মত এবং সমাজ অগ্রগতির নির্ণায়ক– এ কথা কার্ল মার্কস দু'শত বছর আগেই উল্লেখ করেছেন। "কারণ মায়ের দিক দিয়েই জন্মই নির্ধারক, কারণ এইটেই একমাত্র সুনিশ্চিত। যখন সমস্ত ভাইবোনদের, এমনকি মায়ের দিক দিয়ে দূর সম্পর্কের সমান্তর ভাইবোনদের মধ্যে পর্যন্ত যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হল তখনই উপরিউক্ত গোষ্ঠী রূপান্তরিত হচ্ছে গোত্রে –অর্থাৎ মায়ের দিক দিয়ে রক্তসম্পর্কযুক্ত আত্মীয়ের একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী হয়ে ওঠে যাদের নিজেদের মধ্যে বিয়ে চলবে না; এখন থেকে তা সামাজিক ও ধর্মীয় চরিত্রের অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান মারফত নিজেকে ক্রমেই সংহত করে তোলে এবং একই উপজাতির অন্যান্য গোত্র থেকে পৃথক হয়ে ওঠে।"[৫]

বাংলাদেশসহ এই উপমহাদেশের গারো জাতির এই যে আবহমান মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা– এটি তাদেরকে যূথবদ্ধ রেখেছে। এই মাতৃতান্ত্রিকতা তাদের ভূমি ব্যবস্থার মধ্যে মায়ের যে অধিকার তা নিশ্চিত করেছে। যে সমাজে রক্ত সম্পর্কের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এ কারণেই রক্ত সম্পর্কের উপর গারো সমাজ সংগঠিত। গারোদের মধ্যে যে উত্তরাধিকার প্রথা তাকে বলা হয়ে থাকে আখিং। এই আখিং প্রথায় কেবল মেয়েরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। ছেলেরা সম্পত্তির অধিকারী নয়। ছেলেকে মাতৃগৃহ ত্যাগ করে শ্বশুর বাড়ি যেতে হয়। যদিও সে সম্পত্তির অধিকারী নয় তবুও সে নিরাপত্তাহীন নয়। ঘর জামাই হলেও স্ত্রী পরে পরিবারের লোকজন তাকে আপনজনের মতোই গ্রহণ করে। বাড়ির সকল সম্পত্তি দেখাশোনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাকেই দেয়া হয়। এবং স্ত্রী সম্পত্তি বিক্রি করতে চাইলেও পুরুষের মতামতকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়।

গারোদের মাতৃ-অধিকার প্রাচীন। এই অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার আয়োজন এ দেশে খ্রিষ্টান মিশনারীরাই শুরু করেছিল এবং এখনো তা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাদের প্রচেষ্টা সফল হলেও আশ্চর্যজনক যে, এ ক্ষেত্রে তা ঘটে নাই। আর তা গারোদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার রক্ষণশীল ও সংরক্ষণবাদী মানসিকতার কারণে। গারোরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও

তাদের মাতৃ অধিকার থেকে সেভাবে বঞ্চিত করা যায়নি। "গ্রীসের বীর যুগে এঁরাই (ধর্মগুরু) মাতৃ-অধিকার অপসারিত করে পিতৃ-অধিকার প্রতিষ্ঠার আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন। স্পষ্টত এরূপ একটি ধারণায় ধর্মকেই বিশ্ব ইতিহাসে পরিবর্তনের চূড়ান্ত কারিকা মনে করা হয়, তা নিছক রহস্যবাদে পরিণত হতে বাধ্য।[৬]

দার্শনিক কার্ল মার্কস্ মাতৃতন্ত্র থেকে পুরন্নষতন্ত্রে উত্তরণকে উলেস্নখ করেছেন স্ত্রী জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। এ ব্যাপারে মার্কস এর দার্শনিক সহযাত্রী ও প্রিয় বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁর এ বিষয়ের ঐতিহাসিক গ্রন্থ পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'তে উল্লেখ করেছেন যে, "মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল, স্ত্রীলোক হলো পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তানসৃষ্টির যন্ত্র মাত্র। স্ত্রীলোকের এই অবনত অবস্থা যা বিশেষভাবে বীর যুগের এবং ততোধিক চিরায়ত যুগের গ্রীকদের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছিল, তাকেই আস্তে আস্তে পালিশ করে এবং কিছুটা রূপান্তর করে মোলায়েম করা হয়েছে, কিন্তু মোটেই লুপ্ত হয়নি।"[৭]

পুরুষদের এই যে একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো তা থেকে আজও মুক্তি ঘটেনি নারী জাতির। বিশ্ব ইতিহাসের পরাক্রমশালী পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এই ধারাবাহিকতায় কোথাও কোথাও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অপভ্রংশ এখনো লক্ষণীয়। বাংলাদেশ ও ভারতের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গারোদের মাঝে এই যে প্রাচীন মাতৃ-অধিকার রার চলমান লড়াই তা বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য জাতিগুলোর মাঝে অনন্য দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে। বিশ্ব ইতিহাসের ক্রমধারায় মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রের উত্তরণের প্রেতিে পৃথিবীতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবশিষ্ট অংশ খুবই কম। প্রবল প্রতাপশালী পিতৃতন্ত্র মাতৃতন্ত্রকে অপসারিত করেছে। তবে, মাতৃতন্ত্র থেকে অপসারণের ক্রমবর্ধমান কালেও বাংলাদেশে গারো জাতি ও খাসিয়া জাতি সেই অপভ্রংশেরই অবশিষ্টাংশ। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, গারো মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মেয়েরাই সংসারের কর্ত্রী। মাতৃধারায় সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয়ে থাকে। গারো সমাজে পিতৃ অধিকার স্বীকৃত নয়। পুরুষ বিয়ের পর সঙ্গত কারণেই স্ত্রী'র বাড়িতে অবস্থান করে এবং স্ত্রী'র সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে অনেকটাই কেয়ারটেকারের ভূমিকা পালন করে। গারো সমাজকে যদিও মাতৃতান্ত্রিক নারী শাসিত সমাজ বলা হয় তবুও সামাজিক নেতৃত্বে পুরুষের অংশগ্রহণই প্রধান। সাধারণত পঞ্চায়েত বা মাতব্বর পুরুষই হয়ে থাকেন। পঞ্চায়েতে পরুষরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে, এক্ষেত্রে অতোটা জোরালোভাবে না হলেও মেয়েদের অংশগ্রহণও সমানভাবে পরিলতি হয়।

গারো সমাজে নকমা ও নক্রম প্রথা চালু রয়েছে। পরিবারের উত্তরাধিকার সাধারণত ছোট মেয়ের উপর বর্তায়। সে কারণে সেই হলো পরিবারের প্রধান বা নকমা। নকমা তার বাবা-মাকে যাতে বুড়ো বয়সে সেবা-যত্ন এবং দেখভাল করতে পারে এ জন্যই ছোট মেয়েকে নকমা নির্বাচন করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য কোনো মেয়েও নকমা নির্বাচিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে নকমা নির্বাচনের একমাত্র দায়িত্ব হলো মা'র। মা যাকে নকমা হিসেবে নির্বাচিত করবেন সে-ই পরবর্তীতে উত্তরাধিকাররূপে পরিগণিত হবেন। নকমা ছাড়া অন্য মেয়েদেরকে বলা হয় আগাতি। নকমাই মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মা আগাতি মেয়েদেরকেও সম্পত্তি দান করেন। সাধারণত অন্যান্য বোন বা আগাতি মেয়েরা নিজেদের আয় রোজগারে ভিন্নভাবে আলাদা ঘর বেঁধে বসবাস করে। গারো সমাজে নকমার স্বামীকে বলা হয় নক্রম। নক্রম নকমার আপন ফুফাতো ভাই হয়ে থাকে। এখানেও বাবা-মা'র দেখাশোনা ও সেবার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তার সুবিধার্থে ফুপাতো ভাইকে বিয়ে করার এই নক্রম প্রথা চালু রয়েছে।

মাতৃতান্ত্রিক গারোদের নকমা প্রথার উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পত্তি রক্ষা ও বংশধারা বজায় রাখা। যেহেতু গারোদের কৃষিভিত্তিক সমাজ সেহেতু ভূ-সম্পদকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন-প্রণালী গড়ে উঠেছে। গারোরা যখন পাহাড়ে-জঙ্গলে মাহারিভিত্তিক বা গোত্র অনুযায়ী বসবাস করতো তখন তাদের ভূমির কোনো ব্যক্তি মালিকানা ছিল না। এক একটা গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক ভূখন্ড বরাদ্দ ছিল। অনেকটা আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থার অনুরূপ গোত্রের সকলে মিলে এই সম্পত্তি আবাদ করতো এবং আবাদকৃত ফসল জনসংখ্যা অনুপাতে ভাগ করে নিতো। সম্পত্তির দেখভালও সবাই মিলে করতো। এই সমগ্র সম্পত্তির তদারকি করতো একজন নকমা। পরবর্তীতে ঐ নকমার উত্তরাধিকারী নকমাগণ বংশানুক্রমে সম্পত্তি রা করতো।

সম্পত্তি যাতে ভিন্ন গোত্রে চলে না যায় এবং বিভাজিত না হয় সেজন্যই নকমা মনোনীত করা হতো। অন্যদিকে বংশধারায় যেনো বিপ্তি ও বিভাজিত এবং জটিল না হয়ে পড়ে সেজন্য নকমাকে ঘিরেই বংশধারা গড়ে উঠতো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিবারের প্রধান হিসেবে নকমাই সকল মতার অধিকারী ছিল এবং নকমার আপন বোনেরা আগাতি হিসেবে বিবেচিত হতো। মা যদি আগাতি মেয়েদের সম্পত্তি দান করে তবেই তারা সম্পত্তির অংশীদার হতে পারতো। তবে আগাতি মেয়েরা সাধারণত কিছুদিন মায়ের বাড়িতে থেকে নিজে উপার্জন করে আলাদা ঘর-সংসার গড়ে তুলতো।

মাহারিভুক্ত ভূমি ব্যবস্থা যা আখিং প্রথা নামে প্রচলিত। যা মাহারির বা মাতৃগোষ্ঠীর যৌথ সম্পদ। আর এই আখিং ভূমির সর্বময় মতা নকমার। মাহারিভুক্ত এই আখিং ভূমি সকল পরিবারের যৌথ সম্পত্তি হলেও তা রক্ষণাবেক্ষণ ও হস্তান্তরের মতা নক্‌মারই। এক্ষেত্রে নক্‌মা অন্যদের মতামত গ্রহণ করতে পারে।

গারো সমাজে নক্‌মার ভূমিকা অপরিসীম। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, আয়-ব্যয়, জমির ক্রয়-বিক্রয়, গোত্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থান এসব নানাদিক তাকে দেখতে হয়। তবে গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের মতামত দেবার মতা থাকলেও নক্‌মাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবার অধিকারী বলে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে এর একটি নেতিবাচক দিকও লণীয়। আর তা হলো নক্‌মার স্বেচ্ছাচারিতা।

বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই নক্‌মা প্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভূমির পরিমাণ কমে যাওয়া ও গারোদের ব্যাপকভাবে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর এবং এর ফলে সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার প্রবর্তনের ফলে আখিং ব্যবস্থা আজ আর দেখা যায় না। বিশেষ করে সমতলে বসবাসরত লামদানি গারোদের মধ্যে। তবে পাহাড়ি আচ্ছিক গারোদের মধ্যে এই প্রথা এখনও অনেকাংশে লণীয়।

গারো সমাজ নানা গোষ্ঠী বা মাহারিতে বিভক্ত। গারো সমাজে তিন ধরনের গোত্রের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। যেমন ক) মোমিন, খ) মারাক ও গ) সাংমা। গোত্রের মধ্যে বা মাহারীতে অন্তঃবিবাহ নিষিদ্ধ এবং বহির্বিবাহ প্রচলিত। এত্রে মারাক-সাংমা এবং সাংমা-মারাক গোত্রে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সময় সাংমা-সাংমা, মারাক-মারাক অন্তঃবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তখন এই গোত্রকে মোমিন গোত্র বলা হয়ে থাকে। গারো সমাজে স্বগোত্রে বা স্বগোষ্ঠীতে বিবাহ নিষিদ্ধ। কোনো মারাক ছেলে কোনো মারাক মেয়েকে বা কোনো সাংমা ছেলে কোনো সাংমা মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না এবং পুনরায় স্মর্তব্য যে, গারোদের সাধারণত বাড়ির ছোট মেয়েকে নক্‌মা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। আর এই নক্‌মাই হচ্ছে বাড়ির কর্ত্রী। নক্‌মার বরকে বলা হয় নক্রম। আবার এই নক্‌মার কন্যাই পরবর্তীতে উত্তরাধিকার সূত্রে নক্‌মা নির্বাচিত হবে। যদি এই নক্‌মা কন্যাবিহীন অবস্থায় মারা যায় এবং যদি তার কোনো বোন না থাকে তাহলে তার কোনো না কোনো বোনের

সম্পত্তির মালিকানা ও নক্‌মা নির্বাচিত হবে। অন্যদিকে যদি নক্রম (নক্‌মার স্বামী) তার মাতা ব্র
বোনকে বিয়ে করে তাহলে সেই বোনই হবে সমস্ত সম্পত্তির নতুন স্বত্বাধিকারিণী। আগেই ব
হয়েছে যে, নক্‌মার বোনদের বলা হয় 'আগাতি'। এই আগাতিরা যদি পিতার মাচাং বহি
ব্যক্তিকে বিয়ে করে তাহলে তাদেরকে মায়ের সম্পত্তির অধিকার হারাতে হয়। পুনরায় উল্লেখ্য (
গারো সমাজের সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা মাতৃসূত্রীয়। সব সম্পত্তির মালি
মহিলারা। পুরুষ সম্পত্তির মালিক নয়। একজন বিবাহিত পুরুষ তার জীবদ্দশায় যে সকল সম্প
অর্জন করবে তার মালিকও তার স্ত্রীই হবেন, সে নিজে নয়। একজন অবিবাহিত পুরুষের অ
সম্পত্তির মালিক তার মা। মায়ের অবর্তমানে তার বোনেরা। পরিবারে একাধিক মেয়ে থাক
কোন্ মেয়ে নক্‌মা হবে তা নির্ভর করবে তার মায়ের সিদ্ধান্তের উপর। তবে লক্ষণীয় যে, সাধার
দীর্ঘ সময় বাপ-মা'র দেখাশোনা করার জন্য ছোট মেয়েই নক্‌মা নির্বাচিত হয়। দীর্ঘদিন ধ
গারো সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে নানা মতভেদ পরিলতি।

পুনরায় উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, সম্পত্তি রার জন্য Cross Cousin Marriage প্রথা বংশপরম্পর
গারো সমাজে প্রচলিত। এক পত্নী বিবাহ, বহু পত্নী বিবাহ ও বহির্বিবাহ প্রথা গারো সমা
পরিলতি হয়। অন্তঃবিবাহ গারো সমাজে নিষিদ্ধ বা দূষণীয়। এমন বিবাহ গারো সমাজ স্বীকৃ
দেয় না এবং একে পাপ কাজ বলা হয়। প্রথাগত প্রচলিত আইনে এদের সমাজ থেকে পরিত্য
করা হয়।

প্রথানুযায়ী নক্‌মার বিবাহের জন্য তার পিতৃগোষ্ঠী থেকে একজন উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করতে হ
এবং এটিই প্রচলিত নিয়ম। ক্রম অগ্রসরমান বর্তমান সামাজিক প্রোপটে পিতৃগোষ্ঠী থেকে প
নির্বাচন অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। বিশেষ করে বয়সের ব্যবধান, শিক্ষা, পারিবারি
অসামঞ্জস্যতা নক্রম নির্বাচনের জন্য সহায়ক নয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শি
ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে প্রেম নিবেদন করে পছন্দমত ভিন্ন গোত্রের ছেলেমেয়েকে বিব
করে। যদিও বিধি ও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী পিতা-মাতার নির্বাচিত পিতৃবংশীয় পাত্র ছাড়া অ
কাউকে বিয়ে করলে সে তার নকমাত্ব হারাবে, তবুও আজকাল অনেক ছেলেমেয়ে নকমা প্রথ
প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে অন্য গোত্রে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়
এছাড়াও ইদানীংকালে শিক্ষিত ও সচেতন যুবকরা ঘর জামাই হতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। অনে
ক্ষেত্রে নিজের উপার্জিত অর্থ নিজের স্ত্রী বা শ্বশুর-শাশুড়িকে না দিয়ে নিজে স্বাধীনভাবে খরচ কর
ভালবাসে। এছাড়াও দেশের সামগ্রিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে গারো যুবকরা নিজেদের এক ধরনে
ঠুনকো আত্ম-অহমিকা ও আত্ম-মর্যাদাবোধে আক্রান্ত হয়ে স্ত্রীর বাড়িতে থাকতে অপারগতা প্রকা
করছে। পুনরায় উল্লেখ্য যে, পিতার মাচাংয়েই কন্যাকে বিয়ে করতে হয়। বিশেষ করে কন্যা
পিতার বোনের ছেলে বা ফু'ফাতো ভাইকে। এটাই নিয়ম। পরস্পরের পরিচয় এবং সমঝোতা
ভিত্তিতে এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এটা সাধারণত পিতামাতার মত নিয়ে করা হয়ে থাকে। ত
মায়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব ক্ষেত্রে সঙ্গী পছন্দ বা গ্রহণযো
হলে বিয়ে পূর্ব যৌন মিলনকে প্রশ্রয় দেয়া হয়। কিন্তু যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে ছেলে
মেয়েকে সমাজ নির্ধারিত জরিমানা দিতে হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যেমন পুরুষরা বিয়ে করে ঘ
বউ আনে তেমনি গারো সমাজে ঘটে উল্টোটা– মেয়েরা বিয়ে করে জামাই ঘরে আনে। সাধারণ
ছেলের বাড়িতে কনের আগমন ঘটে এবং এখানেই বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর ছেলে মেয়ে
বাড়িতে আসে। গারোদের বিয়ে সাধারণত আচার সর্বস্ব। শাস্ত্রীয় বাধ্যবাধকতা খুব একটা নেই।

বর্তমানে গারোরা খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে অনেক গারোই এখন পুরানো প্রথায় বিয়ে করে না। তারা গীর্জায় গিয়ে ধর্ম যাজকের মাধ্যমে খ্রিষ্ট ধর্মের রীতি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে। তবে তারা গারো ঐতিহ্য অনুযায়ী নানা আনন্দ-উৎসব তারা পালন করে।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, গারো সমাজে বিয়ে বাঙালি ও অন্যান্য পুরুষতান্ত্রিক জাতিগোষ্ঠী থেকে কিছুটা ভিন্ন। পুরুষ শাসিত সমাজে সাধারণত ছেলেরা মেয়ের বাড়ি যায় এবং বিয়ে করে বউ ঘরে নিয়ে আসে। কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক গারো সমাজে মেয়েরা ছেলের বাড়ি যায় এবং বিয়ে করে ছেলেকে ঘর জামাই হিসেবে নিয়ে আসে। এই উল্টোটা ঘটার কারণ হলো যে, মাতৃতান্ত্রিক গারো সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মহিলারাই পরিবারের কর্ত্রী এবং ভূ-সম্পত্তির অধিকারী। কৃষি প্রধান জীবিকার ফলে ভূ-সম্পদকে কেন্দ্র করেই গারোদের জীবনযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। সেক্ষেত্রে পুরুষদের সম্পত্তিতে কোনো অধিকার নেই। তারা সম্পত্তির দেখভাল করেন তথা তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। মায়ের পারিবারিক পরিচয়েই সন্তানেরা পরিচিত হয়। মায়ের উপাধি ছেলেমেয়েরা নামের শেষে ধারণ করে। মা যদি মারাক বংশীয় হয় তাহলে সন্তানও তার নামের শেষে মারাক উপাধি ব্যবহার করবে। অন্যদিকে পিতা যদি সাংমা হয় তাহলে সন্তান সাংমা ব্যবহার করবে না। বিয়ের ব্যাপারেও তাই মেয়েদের ভূমিকা এখানে প্রধান। আর সে কারণেই গারো সমাজে মেয়েরা বর ঘরে আনে। গারো সমাজে সাধারণত তিন ধরনের বিয়ে ব্যবস্'র প্রচলন আছে। প্রথমত ঘটকালীর মাধ্যমে পাতানো বা সামাজিক বিয়ে (Arranged Marriage), দ্বিতীয়ত প্রেমঘটিত বিয়ে (Love Marriage) এবং তৃতীয়ত জোরপূর্বক বিয়ে (Perforce Marriage) ।৮

ঘটকালীর মাধ্যমে পাতানো বা সামাজিক বিয়েকে গারো সমাজে দঃদকা বলে অভিহিত করা হয়। এই বিয়ে দু'পরে অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনদের উপস্থিতিতে কথাবার্তার মাধ্যমে প্রথমে পান-চিনি ও পরে বৈবাহিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে এই বিয়েও তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্বে জামাই খোঁজা, দ্বিতীয় পর্বে জামাই জিজ্ঞাসা এবং তৃতীয় পর্বে বিয়াই পাতা।

অপরদিকে প্রেম ঘটিত বিয়েতে পাত্র-পাত্রী নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করে। গারো ভাষায় তাকে বলে থুনাপা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত নিয়মে সাধারণত ছেলেরাই মেয়ে পছন্দ করে। কিন্তু গারো সমাজে মেয়েরাই ছেলেদেরকে পছন্দ ও প্রেম নিবেদন করে। সাধারণত গারো যুবকদের ঘুমানো এবং বিশ্রামের জন্য বাড়ির বাইরে একটি আলাদা ঘর থাকে যাকে নকপান্তে বলা হয়ে থাকে। এই ঘরে গ্রামের মাতব্বর অনেক সময় বিচার কার্য পরিচালনা করে থাকে। গ্রামের যুবতী মেয়েরা নকপান্তে বসবাসকারী কোনো যুবককে পছন্দ করলে সেখানে গিয়ে নানা কায়দায় প্রেম নিবেদন করে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রেম কাড়িত মেয়েটি ভালো খাবার তৈরি করে নিজের ছোট বোন বা কোনো নিকট আত্মীয়াকে দিয়ে পছন্দের যুবকের কাছে পাঠায়। আর মেয়েটি আড়ালে লুকিয়ে থাকে। ছেলেটি যদি মেয়েটিকে পছন্দ করে তাহলে সরাসরি খাবার খেতে বসে যায়। তখন মেয়েটি আড়াল থেকে সামনে এসে যুবকের সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করে। যুবক-যুবতী এক পাত্রে খাবার খেলে ধরে নেওয়া হয় তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। এ জন্য কোনো অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। তবে প্রেম প্রত্যাখ্যাত হলে মেয়েটির জন্য খুবই লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

কোনো কোনো গোত্রে কোনো বিবাহযোগ্য যুবতী কোনো যুবককে পছন্দ করলে মেয়েটি সরাসরি ছেলেটির নিকট প্রস্তাব দেয়। যুবকটি যদি তাকে পছন্দ করে তাহলেও সরাসরি সম্মতি জ্ঞাপন করে

না। তখন সে গ্রাম থেকে পালিয়ে যায়। এরপর তার একদল বন্ধু তাকে খুঁজে নিয়ে আসে। ভাব দেখে মনে হয় ছেলে এ বিয়েতে রাজি নয়, তাকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ধরে আনা হয়েছে। এবং পুনরায় সে পালায়। দ্বিতীয়বার আবার যখন তাকে খুঁজে আনা হয় তখন মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবে সে রাজি হয়। কিন্তু তৃতীয়বার যদি পছন্দের পাত্র পালিয়ে যায় তবে ধরে নেয়া হয় সত্যি সত্যি পাত্র পাত্রীকে পছন্দ করেনি। এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয়বার পালিয়ে যাবার পর অবশ্য তাকে খুঁজে আনতে হবে। খুঁজে না আনা পর্যন্ত মেয়ের অন্যত্র বিয়ে দেয়া চলবে না। তার অর্থ দ্বিতীয়বার খুঁজে এনে দেখতে হবে পাত্র আবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে কি-না।

কোনো কোনো গোত্রে কোনো মেয়ে কোনো ছেলেকে পছন্দ করলে সরাসরি ঐ মেয়ে ঐ ছেলের সাথে রাত যাপনের প্রস্তাব করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ছেলেটি যদি মেয়েটি পছন্দ করে তাহলে তারা এক শয্যায় ঘুমাতে পারে। কিন্তু ছেলেমেয়ে এক শয্যায় ঘুমালেই তাদের বিয়ে হয়ে যাবে না। ছেলেটি যদি মেয়েটির সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং মেয়েটি যদি অন্তঃসত্ত্বা হয় তবেই তাদের বিয়ে হয়ে যাবে। ছেলে যদি মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি না হয় তবে মেয়েটির সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে না। এক্ষেত্রে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা না হলে তাদের বিয়েও হবে না। তবে রাত্রি যাপনের জন্য মেয়েকে সমাজে নিন্দনীয় হতে হবে না। গারো সমাজে কখনো কখনো মেয়েরা ছেলেদেরকে জোর করে বিয়ে করে। বিশেষ করে মাচ্ছি গোত্রের মেয়েরা কোনো ছেলেকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে ছেলে যদি রাজি না হয় তাহলেও সে তার পিছ ছাড়ে না। খবর রাখে রাতে ছেলেটি কোথায় ঘুমায়। হঠাৎ কোনো একদিন মেয়েটি চুপি চুপি ছেলেটির বিছানায় শুয়ে পড়ে। এবং চেষ্টা করে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের। কখনো কখনো দেখা যায় ছেলেটি দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন না করে গ্রাম থেকে পালিয়ে যায়। এরপরও নানাভাবে নানা কৌশলে চেষ্টা চালিয়ে মেয়েটি ছেলেটির সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। তখন ধরে নেয়া হয় তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আর যদি দৈহিক সম্পর্ক না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, জোর করেও বিয়ে করা সম্ভব হলো না। এই জোরজবরদস্তির বিয়ের জন্য কোনো অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। এখানে ছেলেমেয়ের রাত্রিযাপন এবং গর্ভবতী হওয়াই প্রধান বিবেচ্য।

গারো সমাজে লক্ষ্য করা যায় যে, ছেলেমেয়েদের প্রেমঘটিত কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিভাবকরা তাদের প্রেমকে মেনে নেন না। বিশেষভাবে প্রচলিত নিয়মে গারো সমাজে প্রায়ই পিতার গোষ্ঠী বা মাহারীভুক্ত না হওয়ার কারণে ছেলেমেয়েরা ভিন্ন ভিন্ন মাহারীর ছেলেমেয়েদের সাথে প্রণয় ঘটায়। এক্ষেত্রে তারা গোপনে পালিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও বিয়ে করে। এর ফলে এই দম্পত্তি সমাজে ফিরে আসার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তবে মানবিক কারণে সমাজ কখনো কখনো তাদের গ্রহণ করে।

যাই হোক, প্রচলিত নিয়মে পাতানো বা সামাজিক বিয়ের বেলায় মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হলে পাত্র খোঁজার পর্বকেই জামাই খোঁজা বলা হয়ে থাকে। অপরদিকে নক্‌মা হিসেবে বিবেচিত বা নির্বাচিত পাত্রীর জন্য সাধারণত কন্যার আপন ফুফুর ছেলেকেই জামাই বা নক্রম নির্বাচিত করা হয়। ফুফুর বিবাহ উপযুক্ত ছেলে না থাকলে কন্যার বাবা-মা'র পছন্দ অনুযায়ী অন্য কোনো ছেলেকে নকমার জন্য নক্রম নির্বাচন করা হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণত বর হিসেবে নির্বাচিত পাত্রের মাকে কনের বাবার আপন বোন হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে হয়। যা সমাজে ঘোষণা দিয়ে জানাতে হয়। নকমার অন্য বোন যারা আগাতি তাদের জন্য কন্যার ফুফাতো ভাই পাওয়া না গেলে পিতার গোত্র বা গোষ্ঠীভুক্ত অন্য ছেলেকে পাত্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কন্যার আপন

মাহারীর বা মায়ের গোষ্ঠীর কোনো ছেলেকে পাত্র হিসেবে নির্বাচন করা যায় না। পাত্রকে অবশ্যই কন্যার মাহারীর বা গোষ্ঠীর বাইরের কোনো গোষ্ঠীর হতে হবে।

মেয়ের বাবা-মা কোনো ছেলেকে তাদের কন্যার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত বা পছন্দ করলে ছেলে এবং তার মা-বাবার মতামত জানার জন্য ঘটক পাঠানো হয়। ঘটক ছেলের বাবা-মা'র বাড়িতে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আর গারো সমাজে এটাকেই বলে জামাই জিজ্ঞাসা। অপরদিকে ঘটকের মাধ্যমে জামাই জিজ্ঞাসায় পাত্রের বাবা-মা সম্মতি জ্ঞাপন করলে মেয়ের অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনরা দুই হাঁড়ি মদ ও নতুন জামা-কাপড় নিয়ে ছেলের বাড়িতে যায়। সাধারণত কনের একজন নিকট আত্মীয়া এই জামা-কাপড় নিয়ে যায়। এই আত্মীয়াকে সাধারণত সধবা হতে হয়। অনেক সময় কম বয়সী অনূঢ়া বা কুমারী মেয়েরাও এই কাজে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু গারো সমাজে যারা বিধবা (রান্দি), প্রথা ও সংস্কার অনুযায়ী তারা এ কাজে অংশ নেয় না। এদিন কনেও তার নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে বরের বাড়িতে যায়। সেখানে ছেলেমেয়ে পরস্পরকে দেখা এবং জানার সুযোগ পায়। এতে পাত্রী পরে নেয়া সুস্বাদু খাদ্য ছেলের বাবা-মা, ফুফু, খালা ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে পরিবেশন করা হয় এবং মদ্যপানে আপ্যায়িত করা হয়। এই খাবারকে গারো ভাষায় বলা হয় মিশু ভাত। আর এই অনুষ্ঠানকেই বলা হয় বিয়াই পাতা। যাকে গারো ভাষায় বলা হয় নকচামিখা।

বিয়াই পাতা অনুষ্ঠানের পর পরবর্তীতে কোনো একদিন ছেলে পক্ষ মেয়ের বাড়িতে যায় এবং এদিন বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। এছাড়াও এদিন দাবি-দাওয়া নিয়েও আলোচনা করা হয়। সাধারণত গারোদের বিয়েতে নগদ অর্থ বা উপহার দেয়ার নিয়ম নেই। তবে মেয়ের জন্য গহনাগাটি, জামা-কাপড়, ছেলের জন্য কাপড়চোপড় দেয়ার নিয়ম রয়েছে। এছাড়াও ছেলে তার পিতামাতার কাছ থেকে তরবারী, ঢাল, বল্লম, গরু বা ষাঁড় উপহার হিসেবে পেতে পারে। এই সব উপহার গারোরা খুব যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে। এছাড়াও অনেক সময় ছেলের নানা-নানি একটি নির্দিষ্ট মূল্যের শূকর দাবি করে থাকে।

পূর্ব নির্ধারিত বিয়ের দিনে কনে পরে আত্মীয়-স্বজন বরের বাড়িতে যায়। এদিন বরের আত্মীয়-স্বজনের দাবিকৃত জিনিসপত্র কন্যাপকে নিয়ে যেতে হয়। সাধারণত বরের নানা-নানি, বাবা-মা, খালা-খালু, বড় ভাই ও বোন জামাকাপড় পায়। ছোট ভাইবোনরা জামাকাপড় পায় না। এছাড়াও এদিন ছেলের আত্মীয়-স্বজন এবং ছেলের মাহারির বা গোষ্ঠীর লোকজনদের খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, মদ বা পানীয় পাত্রী পকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। এবং যে সব পাত্রে এই খাদ্য দ্রব্য নিয়ে যেতে হয় সেগুলো আনকোরা বা নতুন হতে হয়। বরের বাড়ির কাছাকাছি গেলে গ্রামের যুবক-যুবতীরা তাদের পথ রোধ করে এবং পাত্রীর কাছে নজরানা দাবি করে। সেখানে কিছু নজরানা দিয়ে বরের বাড়িতে ঢুকতে হয়। বর পরে কোনো একজন সধবা মহিলা বা অবিবাহিত যুবতী কন্যা কনের পা ধুয়ে দিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। অনেক সময় কুমারী কন্যাদের এ কাজে অংশ নিতে দেখা যায়। অতঃপর ছেলে প কন্যা পরে আনা জিনিসপত্র সকলকে দেখায়। বরকে নতুন কাপড় পরানো হয়। কনেকে নতুন কাপড় ও শঙ্খের মালা পড়ানো হয়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের সোনার বা রূপার টঙ্কাছড়া খুবই প্রিয় গহনা। এরপর পানাহার শেষে ছেলেকে তার বাবা-মার কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। ছেলেমেয়ে দু'জনেই ছেলের বাবা-মাকে প্রণাম করে কনের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বর-কনের কাপড় গিট দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। বর-কনে পাশাপাশি হেঁটে চলে। বরের পাশে থাকে বরের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কনের পাশে থাকে কনের ঘনিষ্ঠ একজন বান্ধবী। এ সময় বরের মন খুব খারাপ থাকে। কেননা, সে চিরকালের জন্য

তার বাবা-মা'র ভিটে মাটি ছেড়ে অন্য গৃহে যাত্রা করেছে। কখনো কখনো ছেলে স্বগৃহে ফিরে যেতে চায় এবং অনেক সময় দেখা যায় নিছক আনন্দ-ফূর্তি করার জন্য ছেলে মাতৃ-পিতৃ গৃহে ফিরে যাবার ভান বা অভিনয় করে। সেক্ষেত্রে মেয়ে পক্ষ কৌতুকের ছলে নানাভাবে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে এবং নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে ছেলেকে আশ্বস্ত করে।

জামাই নিয়ে আসার সময় বর পক্ষের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা কিছুদূর পর্যন্ত বাদ্যবাজনা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে দিয়ে যায়। কন্যা পক্ষের আনা শূকরের একটা আস্ত রান কন্যা পক্ষকে দিয়ে দেয়। কনের বাড়ির কাছাকাছি এলে গ্রামের যুবক-যুবতীরা কনেকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। এটা যেন কোনো বীরকে সম্বর্ধনা দেয়া। ভাবটা যেনো আমাদের মেয়ে একটি ছেলেকে হরণ করে নিয়ে এসেছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা নৃত্যগীত সহকারে বর-কনেকে মাল্যভূষিত করে এবং দু'জনকে নৃত্যগীতের আসরে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর ছেলেমেয়েকে একটি নির্দিষ্ট ঘরে বা বিয়ের মন্ডপে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটি মাদুর বা চাটাইয়ের উপর বর-কনেকে বসানো হয়। গারোদের পুরোহিত (খামাল) তাদের সামনে একটি আসনে বসে একটি নতুন কুলায় কিছু ধান, দুর্বা, ধুপ রাখে। তারপর ধুপ জ্বালিয়ে ধান, দুর্বা দিয়ে ছেলেমেয়েকে আশীর্বাদ করা হয় এবং খামাল গারোদের বিভিন্ন দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করে তাদের দোহাই দিয়ে এই বিয়েতে ছেলেমেয়ের সম্মতি আছে কি-না তা জিজ্ঞেস করে। এরপর খামাল মন্ত্র পড়ে একটি মোরগ ও একটি মুরগি দিয়ে বর ও কনের পিঠে আঘাত করে। এবং এক আঘাতে মোরগ ও মুরগি মেরে ফেলে। আর এভাবেই ছেলেমেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয়। গারোরা উৎসব প্রিয় জাতি বিধায় তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে বাদ্য-বাজনাসহকারে নাচ-গানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। আর পানাহার তো রয়েছেই। বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা হৈ-হুল্লোড় করে মদ পান করে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে বিবাহ উৎসবকে আনন্দঘন করে তোলে।

গারোদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত। যদি স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে পাড়ার মাতব্বরের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মতি জ্ঞাপন করে বিবাহ বিচ্ছেদ করে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় স্বামী বা স্ত্রী ব্যভিচারী সাব্যস্ত হলে কিংবা স্বামী বা স্ত্রী সংসার চালাতে অস্বীকার কিংবা অপারগতা প্রকাশ করলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। তবে এ ক্ষেত্রে অনেক সময়ই সমঝোতার চেষ্টা করা হয়। সমঝোতা না হলেই কেবল বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।

গারো সমাজে বহু বিবাহ লক্ষণীয়। মুসলিমদের মতো একজন গারো পুরুষও অনেকগুলি বিবাহ করতে পারেন। যদিও সামাজিকভাবে অনেকাংশেই বহু বিবাহ নিন্দনীয়। তবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী গারো সমাজে সাধারণত একসঙ্গে তিনজন স্ত্রী রাখা যায়। গারো সমাজে একজন পুরুষ দুই সহোদর বোনকেও বিবাহ করতে পারে। সাধারণত প্রথমে বড় বোনকে বিয়ে করতে হয়। তবে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হলে প্রথম স্ত্রীর অবশ্যই অনুমতি নিতে হয়। এত্রে প্রথম স্ত্রীর অনেক সময় দাবি-দাওয়া থাকে। সে সব দাবি-দাওয়া পূরণ করে তবেই দ্বিতীয় বিয়ে করা যায়। দ্বিতীয় স্ত্রী প্রথম স্ত্রীর মাতৃগোত্রের হলেই ভালো হয় এবং এটাই স্বাভাবিক ধরে নেওয়া হয়। তবে দ্বিতীয় স্ত্রী ভিন্ন গোত্রেরও হতে পারে।

গারো সমাজে বিধবা বিবাহ স্বীকৃত। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী তার মাতৃগোত্রের কাছে নতুন স্বামী দাবি করতে পারে। এক্ষেত্রে বিধবা স্বামীর সহোদর ভাই কিংবা তার পছন্দের কাউকে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য নির্বাচন করতে পারেন। সেটা নিজ মাহারি বা গোত্রভুক্ত হতে পারে আবার ভিন্ন গোত্রেরও হতে পারে। তবে যিনি নকমা হিসেবে পরিগণিত তিনি তার স্বামীর মাহারি বা গোত্র ছাড়া

অন্য কোথাও বিবাহ করতে পারবে না। যদি সে তা করে তা হলে তার নকমাত্ব হারাতে হবে।

গারো সমাজে একটি দৃষ্টিকটু বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। বিধবা শ্বাশুড়ি যদি তার মেয়ের নক্রম বা জামাতাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে এই জামাতা তার শাশুড়িকে বিয়ে করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে বিধবার কন্যা জীবিত থাকা সত্ত্বেও পুরুষটি একই সঙ্গে মা ও কন্যার স্বামী হয়। মূলত সম্পত্তির উত্তরাধিকার ঠিক রাখা এবং সম্পত্তি যাতে ভিন্ন মাহারিতে চলে না যায় সে জন্যই গারো সমাজে শাশুড়িকে বিয়ে করার এই দৃষ্টিকটু বিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে।

এছাড়াও "অসম বিয়ে গারো সমাজে বহুল প্রচলিত। কোনো পুরুষ একাধিক বিয়ে করতে চাইলে প্রথমেই প্রথম স্ত্রীর মাহারি হতে দ্বিতীয় স্ত্রী দেবার চেষ্টা করা হয়। এই স্ত্রী দিতে গিয়ে দেখা যায় খুব বয়স্ক ব্যক্তির জন্যে অল্প বয়সী মেয়ে, অনেক সময় অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েকেও দিতে হয়। এমন কি স্ত্রীর ভাগ্নীকেও (বোনের মেয়ে) দিতে দেখা যায়। একজন পুরুষ একই পরিবার থেকে প্রথম স্ত্রীর মা, ছোট বোন, এমন কি ভাগ্নী পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে। একইভাবে বিধবা স্ত্রী মৃত স্বামীর ছোট ভাই কিংবা ভাগ্নেকে বিয়ে করতে পারে। ফলে দেখা যায় স্বামী হয়তো খুবই বয়স্ক আর স্ত্রী অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিংবা স্বামী অপ্রাপ্ত বয়স্ক, স্ত্রী বয়োবৃদ্ধা। মূলত সম্পত্তি রার খাতিরেই অসম বিয়ে সমর্থনযোগ্য।"৯

বাংলাদেশের গারো জাতিসত্তা একটি অনর সমাজের বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান। গারোরা সনাতনী সাংসারেক ধর্মে বিশ্বাসী। এই ধর্ম জড়বাদী। টোটেমিজম (পূর্ব পুরুষ পূজা) এবং মহাপ্রাণবাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গারোরা এখনো ভূত-প্রেতের উপরে বিশ্বাস, দেবতা এবং অপদেবতাদের প্রতি ষষ্ঠাঙ্গে নিবেদন ও পূজা অর্চনা করে থাকে। গারোদের অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাসের নমুনা হলো সর্বপ্রাণবাদ (Animism)।

গারোরা অশরীরী আত্মায় বিশ্বাসী, জন্মান্তরবাদী এবং আত্মার অবিনাশিতায় বিশ্বাসী। গারোদের ধারণা, অসৎ জীবন-যাপন করলে পরজম্মে পশু-পাখি বা জীব-জন্মরূপে পুনর্জম্ম গ্রহণ করতে হয়। আপাত দৃষ্টে গারোদেরকে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুদের মতো পৌত্তলিক মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গারোদের আদি ধর্ম প্রতিমা পূজা বা জড়োপাসনা এর কোনোটাই নয়। গারোদের ধর্ম প্রেতবাদ। তাদের বিশ্বাস সৃষ্টি-দেবতা তাতারা রাবুগা ও তার সহচর নস্তনপাস্তা এবং অন্যান্য দেবদেবীর সহায়তায় পৃথিবী, আকাশ মহল, গ্রহ, নত্র, সাগর, পর্বতমালা, জীব-জন্তু, গাছ-পালা ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। দেবতা তাতারা রাবুগা গারোদের নিকট বিভিন্ন নামেও পরিচিত। গারোদের বিশ্বাস তিনি শুধু পৃথিবী সৃষ্টি করে তার দায়িত্ব শেষ করেন নি, সেই সঙ্গে মানব জাতিকে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্থা প্রদান ও নানাবিধ কল্যাণ, তাদের রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি দেওয়া তাতারা রাবুগার দায়িত্ব। তাতারা রাবুগা ছাড়াও গারোদের উপাস্য প্রধান প্রধান দেবদেবীর নামের তালিকায় রয়েছে চুরাবুদি, নস্তনপাস্তা, সালজং, গোয়েরা, খাল্ বিমে, সুসিমে, অসিমা দিংসিমা, নাওয়াং প্রভৃতি। অপরপক্ষে খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী গারোরা এই ধরনের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতি বিশ্বাসী নয়। তাদের দীক্ষা হচ্ছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর একজন। যিনি বিনা উপাদানে এই বিশ্ব জগৎ ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তবে খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী গারোরাও তাদের আচার-আচরণে গারো সংস্কৃতি মেনে চলে।

গারোদের প্রাচীন ধর্মের নাম সাংসারেক। সৃষ্টিতত্ত্ব মতে গারোদের বিশ্বাস পৃথিবীর স্রষ্টা প্রধান দেবতা তাতারা রাবুগার আদেশে দেবতা নস্তনপাস্তা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। "প্রাণীদের মধ্যে 'তাতারা-রাবুগা' প্রথমে লেজবিহীন বানর জাতীয় একটি প্রাণীকে সৃষ্টি করেন। এই প্রাণীর কাজ ছিল তার বিকট আওয়াজ দ্বারা পৃথিবীকে সচল ও সজাগ করে রাখা। বিশ্ব-প্রকৃতি যাতে কান্তিতে

অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় ঝিমিয়ে না পড়ে এজন্য তাকে তার কর্তব্য কাজে সচল ও সজাগ করে রাখাই ছিল এই প্রাণীর একমাত্র কাজ। এরপর তিনি হনুমান ও বাদামি রঙের বানরগুলো সৃষ্টি করেন। পরে অন্যান্য প্রাণী সৃষ্টি করেন।

"জলচর প্রাণীদের মধ্যে প্রথমে তিনি কয়েকটি বৃহদাকৃতির কদাকার ব্যাঙকে সৃষ্টি করেন। এই ব্যাঙের কাজ ছিল তার বিকট আওয়াজ দ্বারা অন্যান্য জলাচর প্রাণীদের নিকট আকাশে মেঘের আগমন বার্তা ঘোষণা করা। ব্যাঙ সৃষ্টির পর তিনি গভীর পানির অন্যান্য মাছগুলো সৃষ্টি করেন।

"পৃথিবী সৃষ্টির পর 'তাতারা-রাবুগা' দেখতে পেলেন মাটির নিচের অনেক প্রাণী আছে, কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগে কোথাও একফোঁটাও পানি নেই। তখন তিনি পৃথিবীর বুকে নদী প্রবাহিত করলেন। কঠিন এই ধরার বুকে বারিধারা সিঞ্চনের জন্যে তিনি আকাশে 'নরে-চিরে-কিমরে-বকরে' নাম্নী বৃষ্টি দেবীকে প্রেরণ করলেন। আকাশে বৃষ্টির আগমন বার্তা ঘোষণা করার জন্য তিনি 'গোয়েরা'কেও (বজ্র) পাঠালেন।

"তাতারা-রাবুগা' একের পর এক সব কিছুই সৃষ্টি করে চলেছেন। কিন্তু সকল সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ তখনো সৃষ্টি হয়নি। তখন তিনি সকল সৃষ্টির সেরা জীব এই মানুষ সৃষ্টি করার কথা বিবেচনা করলেন।

"মানব সৃষ্টির পূর্বে 'তাতারা-রাবুগা' তার সকল সহকারী দেবতাদের ডাকলেন। তিনি তাদের নিকট মানুষ সৃষ্টি করার কথা ব্যক্ত করলেন। সৃষ্টির সেরা জীব এই মানুষকে মর্ত্যলোকে স্থান দেওয়ার কথাও তখন সকলের নিকট প্রকাশ করলেন। তার এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি দেবী 'সুস্মি'কে প্রথম মানব-মানবীর জন্য বাসস্থান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মর্ত্যলোকে প্রেরণ করলেন।"১২

মোটামুটি এই হলো গারো সৃষ্টিতত্ত্ব। সত্যিকার অর্থে গারো ধর্ম অতিপ্রাকৃতিক বস্তুর বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আগেই যাকে সর্বপ্রাণবাদ বা অহরসরংস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা কিনা পূর্ব পুরুষের প্রতি নৈবেদ্যকে বোঝায়। যাকে টোটেমিজম এবং মহাপ্রাণবাদও বলা যেতে পারে। আসলে সর্বপ্রাণবাদ বা Animism কতগুলো অতিপ্রাকৃতিক বস্তুর উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রণীত। আদি গারোরা বিশ্বাস করে ভূত-প্রেতে। তাতারা-রাবুগা তাদের প্রধান দেবতা। দেবতাদের মধ্যে রয়েছে সালজং ও সুগাইম। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা দেবতার নৈবেদ্য দেয় তথা পশু-পাখি বলি দেয় ও ভোগ প্রদান করে। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, গারোদের অনেক ক্ষেত্রে পৌত্তলিক মনে হলেও গারোরা হিন্দুদের মতো পৌত্তলিক নয়। ধর্মীয় শিষ্টাচারের উদ্দেশ্যে গারোরা নানা অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। তার মধ্যে ফসল বোনা ও ফসল কাটা উল্লেখযোগ্য। এসব অনুষ্ঠান তারা ঘটা করে পালনকালে দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য দেয় এবং তারা জাঁকজমকের সাথে আনন্দ উৎসব পালন করে থাকে।

একটি অনর সমাজের সকল বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও গারোদের লোক-সংস্কৃতি খুবই সমৃদ্ধ। গারোরা সাধারণত উৎসবপ্রিয় জাতি। তাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে নানা আচার অনুষ্ঠান ও লোক-সংস্কৃতি। হিন্দুদের মতো বারো মাসে তেরো পার্বণ গারোদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। উৎসব প্রিয় গারোরা সব সময় আনন্দ হৈ হুল্লোড়ে মেতে থাকে। কিন্তু বর্তমানে গারোদের অধিকাংশই খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করায় গারোদের মাঝে পরিবর্তনের ধারা ব্যাপকভাবে পরিলতি হচ্ছে। বর্তমানে গারোদের আদি ধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা। তবে রক্ষণশীল মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে গারোরা খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হলেও তাদের লোক-সংস্কৃতিকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করেনি। নিজেদের তৈরি মদ পান করে আনন্দ-হুল্লোড়ে মেতে থাকে। আঞ্চলিক ভাষায় মদকে বলা হয়

আবহমান কাল থেকেই অন্যান্য অনেক মঙ্গোলীয় আদিবাসীদের মতোই গারো মেয়েদেরও কাপড়ে বেঁধে পিঠে শিশু বহন করতে দেখা যায়। গারো জনপদের এটি একটি চিরন্তন ম্যাডোনার দৃশ্য। আদিবাসী গারোদের পোশাক-পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী ও বাঙালিদের চেয়ে স্বতন্ত্রতা পরিলতি হয়। মহিলারা হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত লাল আর কালো রঙের মিশ্রিত সেলাইবিহীন কাপড় পরে যাকে বলা হয় 'গান্না গ্রিচাক' এবং কোমরের উপরের অংশে বাহারি ব্লাউজ পরে। তাছাড়াও প্রাচীন গয়নাগাটি যেমন– গলায় টঙ্কা ছড়া, আধুলি ছড়া, সিকি ছড়া ইত্যাদি পরে। দুই কানে দুল, বড় বড় রিং, হাতে চুড়ি বালা, রূপার তৈরি বইল্যা ইত্যাদি পরে।

বিশেষ করে ফসল বোনার প্রস্তুতি এবং ফসল বোনা ও ফসল কাটার নানা অনুষ্ঠান গারোরা পালন করে থাকে। এছাড়াও নতুন গৃহে প্রবেশ, শিশুর জন্মানুষ্ঠান, নানা রকমের খেলাধুলা গারোদের মধ্যে প্রচলিত। গারোরা মদ্যপ প্রিয় জাতি। তাদের সকল অনুষ্ঠানে মদ পান অপরিহার্য। বিশেষ করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যুবক-যুবতী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একত্রে বসে এক পাত্র থেকে পুরুষরা পরে গামছা, ধুতি ইত্যাদি।

উৎসবে গারো মেয়েরা সাজগোজের পাশাপাশি মাথায় ময়ূর কিংবা মোরগের পালক পরে, ছেলেরা পরে মাথায় পাগড়ি। এখনও গারো মেয়েরা আজানুলম্বিত কাপড় বুকে-পিঠে জড়িয়ে বেঁধে রাখে। অশিতি পুরুষরা লেংটি পরে। বর্তমানে প্রায়শই সাধারণ ধুতি শাড়ি পরিহিত গারো পুরুষ ও নারীকে দেখতে পাওয়া যায়। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এবং গারো ছেলেমেয়েদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করায় তাদের মাঝে পোশাকের ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এখন তারা তাদের আদিবাসী পোশাকের পরিবর্তে প্যান্ট-শার্ট, শাড়ি, বস্নাউজ, পেটিকোট, সালোয়ার-কামিজ, স্কার্ট ইত্যাদি পরছে। তবে, উৎসব-পার্বণ ও অনুষ্ঠানে তারা তাদের আকর্ষণীয় আদিবাসী পোশাক পরে থাকে।

আগেই উলিস্নখিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে গারোরা দুই ভাগে বসবাস করে। একটি হচ্ছে আচ্ছিক– যারা পাহাড়ে বসবাস করে। অন্যটি হচ্ছে লামদানি– যারা সমতলে বসবাস করে। গারোদের প্রধান উপজীবিকা হলো কৃষি কাজ। তাদের উৎপাদন পদ্ধতি বা চাষাবাদ প্রণালী প্রাচীন। আদিতে এদের প্রধান পেশা ছিল জুম চাষ। আচ্ছিক বা পাহাড়ি গারোরা জুম চাষ করে। পাহাড়ের জঙ্গল কেটে ও আগুনে পুড়িয়ে এরা জুমের ক্ষেত্র তৈরি করে। চোখা বাঁশ বা লাঠি দিয়ে ছোট ছোট গর্ত করে প্রতি গর্তে মেয়েরা জুমের ক্ষেত্রে নানা ধরনের বীজ বোনে। জুম চাষ কষ্টকর ও বিপদজনক। বন্য হাতি, বন্য শূকর ও জীব-জন্তুর হাত থেকে ফসল রা করার জন্য পরিবারের সম পুরুরা বাশের ফলা, বল্লম ইত্যাদি অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ফসল পাহারা দেয়। এজন্য তারা ২০-৩০ হাত উঁচুতে গাছের ডালে মাচাং বেঁধে টং ঘর তৈরি করে। আর সমতল ভূমির লামদানি গারোরা ভূমি কর্ষণ করে হাল চাষ করে। নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য, শাক-সব্জি, ফল-মূল বিশেষ করে ধান, গম, ভুট্টা, আলু, ডাল, আদা, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, সর্ষে, আনারস ইত্যাদি নিজেরাই উৎপাদন করে। এছাড়াও পাহাড়ি আচ্ছিক গারোরা কার্পাস চাষ করে তুলা উৎপন্ন করে। গারোরা প্রয়োজনীয় পশু-পাখি নিজেরাই পালন করে। পশু-পাখি পোষা ছাড়াও গারোরা শিকার করতে ভালোবাসে। গারোরা কৃষিকাজ ছাড়াও হাতের নানা কাজ করে। গারো সমাজের মেয়েরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। জুমে ও খেতে চাষবাস ছাড়াও বাড়িতে কাপড় বোনা, রান্না-বান্না, ঘর-দোর গোছানো, ছেলেমেয়ের যত্ন নেয়া, পোষা পশু-পাখি পালন, জ্বালানী সংগ্রহ, হাট-বাজারে যাওয়া ইত্যাদি সব কাজ তারা করে। এছাড়াও গারোরা বাঁশ বেত দিয়ে নানা রকমের

জিনিসপত্র তৈরি করে। এরা সুতা তৈরি, রং তৈরি, তাঁতে কাপড় বোনা, বাঁশ-বেতের কাজ, সূতারের কাজ ইত্যাদি নিজেরাই করে। বাঁশ দিয়ে কুলা, চালুনি, চাটাই, ডালা, ডোল, মাছ ধরার নানা রকম ফাঁদ, বেত দিয়ে চেয়ার টেবিলসহ নানা রকম আসবাবপত্র তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এসব হাতের কাজ ছাড়াও শিতি গারোরা বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে, গারোরা অনেকাংশেই বেহিসাবী, নানা রকম উৎসব-পার্বণ এবং আতিথেয়তার কারণে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করে এবং প্রায় ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

বাঙালিদের মতোই গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস, তরি-তরকারি। সব রকমের মাছ ও সব রকমের মাংস বিশেষ করে শূকর, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি, কবুতর ইত্যাদি প্রায় সব প্রাণীই ভক্ষণ করে। এছাড়াও কচ্ছপের মাংস ও কুচিয়া মাছ গারোরা আগ্রহের সাথে খেয়ে থাকে। বন্য প্রাণীর মধ্যে খরগোশের মাংস গারোদের অতি প্রিয় খাদ্য। গারোরা সাধারণত তাদের রন্ধন কার্যে তেল কম ব্যবহার করে। তবে, বর্তমান প্রজন্মের গারোরা বাঙালিদের মতোই চর্ব্যচোষ্য হয়ে উঠেছে এবং এখন তাদের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এদের রান্না ও বাঙালিদের রান্না পদ্ধতির মধ্যে এখন আর তেমন কোনো পার্থক্য পরিলতি হয় না। লক্ষণীয় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলনায় বর্তমানের গারো মেয়েদের রান্না অতুলনীয়।

গারোরা সাধারণত প্রাচীনকাল থেকেই ভূমি থেকে উঁচুতে মাচা পেতে ঘর তৈরি করতো। বিশেষ করে পাহাড়ি আচ্ছিক গারোরা। এটা করতো তারা বন্য প্রাণীর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য। পরবর্তীতে সমতলের লামদানি গারোদের মাঝেও মাচা পেতে ঘর তৈরি করতে দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে সমতলের গারোরা এখন আর মাচাং নির্মাণ করে না, স্থানীয় বাঙালিদের মতোই ভূমিতে সাধারণ ঘর-বাড়ি তৈরি করে। পাহাড়ি গারোরা অবশ্য এখনো মাচাং তৈরি করে। খড়ের চাল ও বাঁশের বেড়া দিয়ে উঁচুতে তৈরি এই মাচাংগুলোর বৈশিষ্ট্য ভিন্ন রকম। দূর থেকেই মনে হবে এটি একটি গারো গ্রাম।

অন্যদিকে গারো যুবকদের বাস করার জন্য এরা বাড়ির অদূরে গ্রামের মাঝখানে নাকপান্ত নামে ঘর তৈরি করে। গ্রামের মোড়ল এই ঘরকে প্রয়োজন মতো বিচার কার্যে ব্যবহার করে। তাছাড়া গারোরা গোয়াল ঘর বসত ঘর থেকে দূরে তৈরি করে। সাধারণত বসতবাটি ও নাকপান্তে গারোরা মহিষের শিং, হরিণের শিং ইত্যাদি টাঙ্গিয়ে সুসজ্জিত করে রাখে। এটাকে তারা তাদের শৌর্য বীর্যের প্রতীক মনে করে।

মৃত্যু পরবর্তী আনুষ্ঠানিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গারো সমাজে প্রচলিত। গারোরা কাঠের চিতা জ্বালিয়ে মরদেহ দাহ করে। তবে কখনো কখনো কোনো কোনো গোত্রে মরদেহ মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে দেখা যায়। বিশেষ করে কলেরা, বসন্ত, কুষ্ঠ, কালাজ্বর– এসব ধরনের কোনো সংক্রামক রোগে কেউ মারা গেলে মহামারীর আশংকায় মরদেহ পুঁতে ফেলার রীতি প্রচলিত।

গারোদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নানা আনুষ্ঠানিকতা প্রচলিত। বিশেষ করে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে খবর দেয়া হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা নানা উপঢৌকন নিয়ে হাজির হয়। এসব উপঢৌকন বিশেষ করে কাপড়-চোপড়, কাঁসা পিতলের বাসন-কোসন মৃত ব্যক্তির লাশের সাথে দিতে হয়। তাছাড়া আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে আসা গরু-ছাগল, শূকর, চাল-ডাল, তরি-তরকারি রান্না করে সকলকে খাওয়াতে হয়। বাদ্য-বাজনা সহকারে নৃত্য গীতের ও মদ্যপানের আয়োজন করতে হয়। যা খুবই ব্যয় বহুল। গারোদের বিশ্বাস মৃত ব্যক্তির আত্মা সুদূর কৈলাশ পর্বতে

আদিবাসী নারীরা কতটা নিরাপদ!

অ.ভি. তঞ্চঙ্গ্যা

১৯৭১ এর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌমত্ব দেশ। ৩০ লক্ষ্য শহীদের রক্তের বিনিময়ে হাজার হাজার মা বোন তথা নারীর নির্যাতনের বিনিময়ে অর্জিত যে স্বাধীনতা তা আজ ৩৭ বছর পেরিয়ে ৩৮ বছরে পর্দাপণ করেছে। কিন্তু স্বাধীনতার এতটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই স্বাধীনতার সুবাতাস কতটুকু বইতে পেরেছে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। আজ আমি লিখছি আদিবাসী নারী কতটা নিরাপদ সে প্রসঙ্গে– কারণ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে যতগুলো সংগ্রাম হয়েছে এতে প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্যাতিত হয়েছে নারীরা। আজকে আদিবাসীদের নিয়ে আলাদা ভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে তার কারণ আমাদের সমাজের আদিবাসী নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে আদিবাসী ও সংখ্যালুঘু নারী বলে। দেশে নারী নির্যাতনে চিত্র ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। নিত্য নতুন কৌশলে নারীদের উপর চালানো হচ্ছে নির্যাতন। এটা ঠিক যে, যেখানে বেশিরভাগ নারীই নিরাপত্তা নাই সেখানে আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তা দেওয়া কতটুকু সম্ভব। তবে এটা ব্যাতিক্রম যে, বাঙালি নারী নির্যাতিত হলে বিচার চাইতে পারে, মামলা করতে পারে কিন্তু আদিবাসী নারীরা নির্যাতিত হলে সাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় তার সকল অধিকার। বাস্তব ক্ষেত্রে একটা জিনিস প্রত্যেক্ষ করলে আমরা দেখি যে, একজন আদিবাসী ছেলে কর্তৃক কোন আদিবাসী মেয়ে ধর্ষিত হয় না। যদি তা হত আমরা প্রত্যেক্ষ পরোক্ষভাবে শুনতাম বা পত্রিকায় দেখতাম। কিন্তু সচরাচর প্রায় পত্রিকায় আমরা দেখি বাঙালি কর্তৃক আদিবাসী নারী ধর্ষণ বা কোন বাঙালি নারী বাঙালি ধারা ধর্ষিত হয়। এটা ঠিক যে, আদিবাসী নারী কখনও কোন আদিবাসী ছেলে ধারা নিরাপদহীন নয়, যতটা না অনিরাপদ বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠী দ্বারা।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত দেশেও ঘটা করে গত ৮ই মার্চ পালিত হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এবারে নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল **"নারী ও কন্যা শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসা রোধে নারী পুরুষ ঐক্যবদ্ধ হোন"** এটা গর্বের বিষয় যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী এবং পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্রের মত গুরম্নত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও দেওয়া হয়েছে নারীদের। নারীর অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন সংগঠনগুলো তৎপর থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে নারী অধিকার কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে তা প্রশ্নের বিষয়। গত নারী দিবসে বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ইলিরা দেওয়ান "দৈনিক প্রথম আলো" পত্রিকায় একটি কলাম লিখে ছিলেন– 'খাগড়াছড়ি জেলার বোয়ালখালীতে তিন বছরের শিশু তার বন্ধুদের নিয়ে মাইনি নদীর তীরে খেলছিল আর তখনই ঐ শিশুটি যখন তার মায়ের চোখের আড়াল হল তার সাথে সাথে শিকার হতে হল নরপশুদের আক্রমণে। এদে দিঘীনালা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩ এর -৯(১) ধারায় মামলা করা হয়। পরে পুলিশ আলামতসহ ঐ নরপশুকে আটক করে।' আমরা এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করি পরবর্তীতে যাতে কোন শিশু বা নারী এরূপ নির্যাতন শিকার না হয়।

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে এবং খ্রিষ্টান মিশনারীদের আগমনের ফলে তাদের মধ্যে শিক্ষিতজনের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি তারা হালে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে লেখাপড়া করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করে অনেকেই শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে আসছে। বর্তমানে অধিকাংশ গারো ছেলেমেয়ে যেমন বিদ্যালয়মুখী হচ্ছে তেমনি তারা ধাপে ধাপে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে বাঙালিদের সাথে সমানতালে এগিয়ে আসছে। আজকাল গারোদের মধ্যে শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি ভালো লক্ষণ।

ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে লক্ষণীয়ভাবে গারোদের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের গারো ছেলেমেয়েরা বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শেখার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের ভাষাই ভুলতে বসেছে। অন্যদিকে, পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয়। গারোদের মাঝে পোশাক-আশাক ও আচার-আচরণে ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া জোরেশোরে বইছে। বিশেষ করে পশ্চিমা জিনস সংস্কৃতির ঢেউও গারোদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাদের আনন্দ উৎসব উদ্‌যাপনেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে এবং বর্তমান বিশ্বের পরিবর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় গারোদের মাঝে যদি এই পরিবর্তন অপসংস্কৃতির গড্ডালিকায় প্রবাহিত হয় এবং তার ফলে যদি তাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক স্বকীয়তাকে ম্লান করে দেয় তাহলে তা হবে তাদের জন্য যেমন দুঃখজনক তেমনি একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হবে বিলুপ্ত। এক্ষেত্রে তাদের নিজেদেরই স্বকীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে রক্ষা করতে হবে। তবে পাশাপাশি রাষ্ট্র ও মূল স্রোতের বাঙালিরা এ ব্যাপারে তাদের হাতকে প্রসারিত করতে পারে।

তথ্য সূত্র

১. ময়মনসিংহ জেলা গেজেটিয়ার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৯০

২. ঐ

৩. রবিন্স বার্লিং, 'মান্দিরা কোথা থেকে এসেছে', জানিরা, ৭ম সংখ্যা, ১৯৮৬, উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, নেত্রকোনা, ১৯৮৬, বাংলা অনুবাদ ঃ কিবরিয়াউল খালেক।

৪. ঐ

৫. ঐ

৬. ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, 'পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', কার্ল মার্কস ফ্রেডরিক এঙ্গেলস রচনা-সংকলন (২য় খন্ড, ১ম অংশ), প্রগতি প্রকাশনা, মস্কো, ১৯৭২, উদ্ধৃত ঃ বারেন্দ্র দ্রং, 'মাতৃতন্ত্রের অন্তরালে গারো যুব চেতনা', জানিরা, গবেষণা জার্নাল, ৭ম সংখ্যা, ১৯৮৬, উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি, নেত্রকোনা।

৭. ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিমালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা-সংকলন (২য় খন্ড, ১ম অংশ), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ.১৭৯, ২০০

৮. ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, ঐ, পৃ.১৭২, ২১৪

৯. ঐ, পৃ.১৭২, ২১৪

১০. ঐ, পৃ.১৭২, ২১৪

১১. বিস্তারিত দেখুন, সোহেল রেজা, 'গারো সমাজে বিয়ে ব্যবস্থা', জানিরা, ৮ম সংখ্যা, ১৯৮৮, ঐ

১২. বিধি পিটার দাংগ, 'গারো সৃষ্টিতত্ত্ব', জানিরা, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮১, ঐ

হাজং পরিচিতি : উৎপত্তি ও অবস্থান

সোহেল হাজং

বৃহত্তর ময়মনসিংহে উত্তরাংশ ভারতের মেঘালয় সীমান্ত সংলগ্ন (গারো পাহাড় ও এর পাদদেশ) অঞ্চলগুলোতে হাজংদের বসবাস। বর্তমানে দেশের চারটি জেলায় এদের বসতি এখনো প্রতীয়মান। শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতী, শ্রীবদী উপজেলায়, ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায়, নেত্রকোণো জেলার সুসং দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলায় এবং সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর, ধরমপাশা, তাহেরপুর, বিশ্বম্বরপুর ও দোয়ারা উপজেলায় হাজংরা বাস করছে। তবে গাজীপুর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, মির্জাপুর, সখিপুর ও ভালুকা উপজেলায় হাজংদের বসবাস রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। বিচ্ছিন্নভাবে থাকার কারণে তাদের পরিচয় 'সূর্যবংশী বর্মণ' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। অতীতে হাজংগণ নিজেদেরকে বর্মণ নামে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন যার প্রমাণ মেলে হাজংদের জমাজমির অতীতের সি, এস, আর এস আরওআর প্রভৃতি রেকর্ডে। তবে হাজংদের গোত্র, নিকনী ও সংস্কৃতি ধারার সাথে গাজীপুর ও ভালুকার বর্মনদের মিল আছে বলে এখানকার কিছু বর্মণ নিজেদের হাজং হিসেবে স্বীকার করে। বর্তমানে যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতার কারণে তারা বর্মণ পরিচয়ে, বর্মণ সমাজে বাস করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। এছাড়াও ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড় খাসিয়া পাহাড়। আসামের নওগাঁ, কামরূপ, হোজাই, গোয়াল পাড়া, নলবাড়ী, দরং ও অরুণাচল অঞ্চলে হাজংদের বসবাস রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, শান্তিপুর, খরদহ ইত্যাদি এলাকায় হাজংদের বসবাস রয়েছে। আবার ১৯৬৪ সালে হাজংদের অনেকে এদেশ থেকে ভারতে যাওয়ার পর ভারত সরকার বেশ কিছু হাজং পরিবারকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পুনবার্সন করায় সেখানেও কিছু হাজং অবস্থান করছে।

১৯৯১ সালের সরকারী হিসাব অনুযায়ী হাজং জনসংখ্যা এদেশে ১১,৪৭৭ জন। ১৩৩৯ বাংলা সনের ধনেশ্বর বর্মণের লিখিত গ্রন্থ 'হাজং কুল প্রদীপ' এর প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী এদেশে ৬০,০০০ এর মত হাজংদের বসবাস ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনে আক্রান্ত হয়ে এদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৩৭ হতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে হাজংদের টংক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় এবং ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ে গ্রামের পর গ্রাম হাজং– এদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যায়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে হাজংদের বর্তমান সংখ্যা ১৩,৫০০ জন মাত্র (মতিলাল হাজং এশিয়াটিক সোসাইটি)। তবে কেউ কেউ অনুমান করেন এদের সংখ্যা ১৮/১৯ হাজার। তবে যাই হোক এদেশের চারটি জেলার হাজং অধ্যুষিত ১০৪টি গ্রামে বর্তমানে হাজংদের সংখ্যা ১৫ হাজারের বেশী খোঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। অথচ ১৬৬৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় ৩৪০টি গ্রামে হাজংদের বসতি ছিল। অবাক করা বিষয় হলো অধিক হাজং গ্রাম অধ্যুষিত ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় বর্তমানে একটি গ্রামেও আর হাজংদের খোঁজে পাওয়া যাবে না। বর্তমানে বেশিরভাগ হাজং গ্রামগুলোতে ২০-৩০টি করে হাজং পরিবার রয়েছে। শুধুমাত্র বেলতৈল, নয়নকান্দি ও ঘিলাগড়া এ তিনটি গ্রামে প্রত্যেকটিতে ৬০টিরও অধিক করে হাজং পরিবার রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার অভাব ও ব্যবসা বাণিজ্যের মন মানসিকতা না থাকায় শহরে হাজংদের আগমন খুব কম লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে ঢাকা শহরে বর্তমানে ৩০০ জনেরও কম হাজং রয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

জাতিগোষ্ঠীর উৎপত্তির পটভূমিঃ হাজংদের উৎপত্তি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ কোন ধারণা ও বাস্তবভিত্তিক নিয়ে যা আলোচনা তার বেশির ভাগই প্রাচীন কালের কিছু পৌরাণিক কাহিনী ও বংশ পরম্পরায় শ্রুতি কাহিনী নির্ভর। বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী, গবেষক ও লেখক হাজংদের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন নৃবিজ্ঞানী মিঃ জে কে বোস-এর মতে হাজংরা গারোদেরই একটি দল। লোক শ্রুতি ও বিভিন্ন লেখকদের মতে, হাজংরা আসামের কামরূপ জেলার হাজং অঞ্চল থেকে এদেশে এসেছে। প্রবীণ হাজংদের মতে, তাদের আদিনিবাস বিহারের অদূরে অবন্তিনগর (মালব) নামক স্থানে এবং নিজেদেরকে তারা সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলে দাবি করেন।

উৎপত্তি বিষয়ক লোককাহিনীঃ হাজংদের লোককাহিনী মতে, অবন্তিন গরীতে পুষ্পরথ নামে এক রাজা ছিলেন। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় নির্ধনকারী পরশুরাম যখন ক্ষত্রিয়দের নির্মূল করার অভিযান চালায় সে সময়ে অবন্তিন গরের হাজং রাজা পুষ্পরথ নিহত হন। পঞ্চমাসের অন্তঃসত্ত্বা রানী স্বরূপা আত্মরক্ষার্থে তার অনুসারীদের নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পলায়ণ করে আসামের কামরূপ রাজ্যের কামদণ্ড মুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেবী স্বরূপা মুনির আশ্রয়ের সেবা যত্নের পাশাপাশি আদিদেবী কামাক্ষার নিত্য পূজা করতেন। কিছুদিন পর রানী স্বরূপা দেবীর গর্ভে পদাঙ্ক নামে এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। পদাঙ্ক বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে কামদত্ত মুনির নিকট শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে হাজোনগর ও মাধব মন্দির পরিচালনার দায়ভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে রাণী স্বরূপার বংশধরগণ কামাক্ষা দেবীর পূজা অর্চনার যাবতীয় কাজ পরিচালনা করে আসেন, যা অদ্যাবধি চালু রয়েছে। ঐ রাজবংশের শেষ রাজা ভাস্কর বর্মন এর সময়ে হাজো রাজ্যের পতন ঘটে এবং এই হাজো নগর থেকে কাশ্যপ বর্মণ নামে এক দলপতি ১২ হাজার লোক নিয়ে গারো পাহাড়ের পশ্চিম-দক্ষিণ অংশে কড়ইবাড়ী পুটিমারি নামক স্থানে আস্তানা স্থাপন করে। এই স্থানটি গারো পাহাড়ের নামাগিরী ও অর্জুনগিরী অঞ্চলের বার হাজারী পরগণা নামে পরিচিত।

বাংলাদেশ ভূখন্ডে হাজংদের বসতিস্থাপনঃ উল্লেখিত কড়ইবাড়ী কম্পানদী বা কালনদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানটি কাশ্যপ বর্মনের নামানুসারে কাশ্যপ নগর নামে পরিচিতি লাভ করে। আজও এই কড়ইবাড়ী অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক হাজংদের বসবাস রয়েছে। এই কড়ইবাড়ী বারহাজারী ছিল হাজংদের সংযোগস্থল। এখান থেকে হাজংরা দলবল নিয়ে কৃষি কাজের উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে বাংলাদেশের শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী উপজেলার লাউচাপড়া নামক স্থানে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করে এবং ঐ স্থান থেকে পশ্চিমে রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অপর একটি দল পূর্বে সুসং দুর্গাপুর হয়ে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারা বাজার উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে দক্ষিণাঞ্চলে কিশোরগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

মূলত দেখা যায় হাজংদের সুদূর চিনের হোয়াংহো নদীর অববাহিকা থেকে তিব্বত, তিব্বত থেকে অবন্তীনগর (মালব) অবন্তনগর থেকে প্রাগজ্যোতিষপুর (গৌহাটী) হাজোনগর এবং এই হাজোনগর থেকে গারো পাহাড়ের কড়ইবাড়ী বারহাজারী থেকে বাংলাদেশে বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে।

নামকরণঃ হাজং নাম করণটি প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে এসেছে বলে হাজং জাতিসত্তার লোকেরা বিশ্বাস করে। নৃতত্ত্ববিদ Cohonel dalton H.B Rowney, Waddle প্রমুখের মতে, কাছাড়ী শব্দ 'হাজাই' থেকে হাজং শব্দের উৎপত্তি। হাজাই শব্দের অর্থ সমতলবাসী। তাঁরা মনে করেন কাছাড়ীরা দুটি দলে বিভক্ত। একটি হচ্ছে সমতলবাসী, অপরটি হচ্ছে পর্বতবাসী।

নৃতত্ত্ববিদ হাডসন (Hodgson) এর মতে, 'হাজং' শব্দটি কাছাড়ী শব্দ হাজো থেকে এসেছে। কাছাড়ী ভাষায় 'হা' অর্থ পাহাড় এবং 'জো' অর্থ পর্বত। পাহাড় পর্বতে বসবাস করে বলে তাদের কাছাড়ী ভাষায় হাজো বলে। তবে যাই হোক হাজংরা যে কাছাড়ীদেরই একটি শাখা এব্যাপারে অনেক বিশেষজ্ঞই একমত। এ ব্যাপারে হাজংদেরও অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। অন্যদিকে হাজংরা এটাও মনে করে যে 'হাজং' শব্দটি গারোদের দেয়া। হাজংরা ভালো কৃষিকাজ জানতো এবং কৃষি কাজের প্রতি তারা খুব বেশি মনোযোগী ছিল তাই গারোরা তাদের নাম দিয়েছিল 'হাজং' বা মাটির পোকা। কারণ গারোদের ভাষায় 'হন' অর্থ মাটি আর 'জং' অর্থ কীট বা পোকা। হাজং সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকদের তাদের 'হাজং' নামকরণের নিজস্ব অভিমত হলো– হাজ শব্দের অর্থ সংঘবদ্ধ, প্রস্তুত, গ্রহনীয় হওয়া, বেঁচে থাকা ইত্যাদিকে বুঝায়। তাদের ভাষায় 'ং' শব্দের অর্থ প্রস্তাব বা আহ্বান। সুতরাং হাজ + ং = হাজং শব্দের অর্থ সংগঠিত হই। সংঘবদ্ধ থাকি, গ্রহনযোগ্য হই, বাঁচার চেষ্টা করি ইত্যাদি। তবে হাজং জাতি পাহাড় অরণ্যে বেঁচে থাকার জন্য যে সুসংগঠিত ভাবেই এককালে বসবাস করত তা বর্তমানেও তাদের বসবাসরত গ্রামগুলোতে গেলে সহজে বুঝা যায়।

লেখক: ছাত্র, সমাজকল্যাণ বিভাগ, ঢা.বি.।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা ও ত্রিপুরাদের আদিবাসী নাট্যচর্চা

আজাদ বুলবুল

পার্বত্য চট্টগামে নাট্যচর্চার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে যে স্তর দিয়ে আলোচনা শুরম্ন করতে হবে তা হলো যাত্রাপালার যুগ। এখানে বসবাসরত ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই যাত্রাপালা অভিনয়ের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৮৭৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন জেলা প্রশাসক ক্যাপ্টেন টি,এইচ, লুইন মং সার্কেল চীফের আমন্ত্রনে রাজ পূন্যাহ উৎসবে মানিকছড়ি যেয়ে সেখানে আদিবাসী অভিনেতাদের যাত্রাভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে ছিলেন। সে সময় মহালছড়ির 'মনাটেক' ও নান্যাচরের সাপমারা এলাকায় গড়ে উঠেছিল গ্রামীন যাত্রাদল। বিভিন্ন মেলা, উৎসব, পূন্যাহ ছাড়াও জুম ফসল ঘরে উঠবার পর পাড়ার লোকেরা সমবেত উদ্যোগে যাত্রাদল এনে গ্রামে গ্রামে পালাগানের ব্যবস্থা করতো। পাহাড়ী জনপদে সে সময় অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এসব যাত্রাপালা। যদিও আদিবাসীদের অভিনীত এসব যাত্রাদলে মূলতঃ বাংলা যাত্রাপালার অভিনয় হতো। মেলা ও উৎসবে টাকার বিনিময়ে এসব যাত্রাদলকে ভাড়া করতো অনুষ্ঠান আয়োজকরা। রাতভর জেগে বিমোহিত দর্শকরা উপভোগ করতো যাত্রাপালার অভিনয়। দুই দৃশ্যের মাঝে থাকতো নর্তকীদের শিল্পবর্জিত নৃত্য। কারো কারো নৃত্যকলা আবার ছুয়ে যেতো শ্রোতাদের অন্তর। নন্দরানী চাকমা ও মানসী চাকমা নামে দু'জন আদিবাসী তৃত্যশিল্পীর খুব সুনাম হয়েছিল যাত্রাপালায় অভিনয়ের সুবাদে। গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শহরাঞ্চলেও যাত্রাপালার আয়োজন হতো। রাঙ্গামাটি, মানিকছড়ি, রামগড়, বান্দরবান ও চন্দ্রঘোনায় যাত্রাদল আসতো সমতলের বিভিন্ন এলাকা থেকে। রাজপূন্যাহ ও মাঘী পূর্ণিমায় রাঙ্গামাটি রাজবাড়ি মাঠে এবং থানা মাঠে যাত্রাপালার অভিনয় হতো। মেলা জমজমাট করার জন্য আয়োজক কর্তৃপক্ষ যাত্রাপালা উন্মুক্ত রাখতো সব শ্রেণীর দর্শকদের জন্য। মাঝে মাঝে স্থানীয় যাত্রাদল ও সমতল থেকে আসা যাত্রাদলের মধ্যে নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। রাতজাগা দর্শকদের মুগ্ধ হাততালির মধ্য দিয়ে যাত্রাপালার সূত্র ধরে আধুনিক আদিবাসী নাট্যচর্চার সূচনা হয়েছিল গত শতাব্দির মধ্যভাগে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম নাট্যকার হিসাবে আমরা যার নাম জানতে পারি তিনি হলেন কুমার কোকন দাস রায় তার প্রথম নাটিকা ১৯৩৭ সালে 'গৈরিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার প্রকাশিত অন্যান্য নাটকগুলো হচ্ছে দক্ষিণের মন্ত্র গুন্ডারণে (১৯৪০), নীড়ের মায়া (১৯৪১), এয়ী (১৯৪৩) এম এ ও বি এ (১৯৪৫) দক্ষিণ হাওয়া (১৯৫২) এবং বধু ফোন আলো (১৯৬৯)। এ নাটকগুলোর অধিকাংশই মঞ্চস্থ হয়েছিল কাপ্তাই হ্রদে নিমর্জিত হওয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম গণমিলনায়তন কারমাইকেল রচিত 'পরিমান' নাটকটি ১৯৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে সুপ-িত শ্রীমৎ মহাথেরো বৌদ্ধ ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বনে ধর্মসভার মঞ্চে অভিনয় উপযোগী এ নাটকটি রচনা করেন। রাজমাতা বিনীতা রায় রচিত 'গ্রামের কল্যাণ' নাটকটি চট্টগ্রাম পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক মঞ্চস্থ, পুরুস্কৃত ও পুস্তক আকারে প্রকাতি হয়। ষাটের দশকে বরেন ত্রিপুরার 'সবজান্তার ভাষা বিভ্রাট নাটকটি রাঙ্গামাটিতে মঞ্চস্থ হয়ে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। আরি দশকে নাটকটি উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা গিরি নির্ঝরে প্রকাশিত হয়। বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ভগবান বুদ্ধের জীবন অবলম্বনে 'অমিতাভ' নামে তিন অঙ্গের একটি নাটিকা রচনা করেন। অপ্রকাশিত এ নাটিকাটি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ হয়েছিল রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে। এছাড়া নব্বই দশকের শেষভাগে রচিত প্রভাংশু ত্রিপুরার ঐতিহাসিক নাটক 'ত্রিপুরেন্দ্র' খাগড়াছড়ির বিভিন্ন মঞ্চে সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ত্রিপুরার মাণিক্য রাজেণ্যদের শৌর্য বীর্যের এ আখ্যায়িকায় ভাল ও মন্দ মানুষের দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে 'শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন' এ সত্যবাণীকে তুলে ধারা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম নাট্যকার হিসাবে আমরা যার নাম জানতে পারি তিনি হলেন কুমার কোকন দাস রায় তার প্রথম নাটিকা ১৯৩৭ সালে 'গৈরিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার প্রকাশিত অন্যান্য নাটকগুলো হচ্ছে দক্ষিণের মন্ত্র গুন্ডারণে (১৯৪০), নীড়ের মায়া (১৯৪১), এয়ী (১৯৪৩) এম এ ও বি এ (১৯৪৫) দক্ষিণ হাওয়া (১৯৫২) এবং বধু ফোন আলো (১৯৬৯)। এ নাটকগুলোর অধিকাংশই মঞ্চস্থ হয়েছিল কাপ্তাই হ্রদে নিমর্জিত হওয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম গণমিলনায়তন কারমাইকেল রচিত 'পরিমান' নাটকটি ১৯৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে সুপ-িত শ্রীমৎ মহাথেরো বৌদ্ধ ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বনে ধর্মসভার মঞ্চে অভিনয় উপযোগী এ নাটকটি রচনা করেন। রাজমাতা বিনীতা রায় রচিত 'গ্রামের কল্যাণ' নাটকটি চট্টগ্রাম পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক মঞ্চস্থ, পুরষ্কৃত ও পুস্তক আকারে প্রকাতি হয়। ষাটের দশকে বরেন ত্রিপুরার 'সবজান্তার ভাষা বিভ্রাট নাটকটি রাঙ্গামাটিতে মঞ্চস্থ হয়ে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। আরি দশকে নাটকটি উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা গিরি নির্ঝরে প্রকাশিত হয়। বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ভগবান বুদ্ধের জীবন অবলম্বনে 'অমিতাভ' নামে তিন অঙ্গের একটি নাটিকা রচনা করেন। অপ্রকাশিত এ নাটিকাটি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ হয়েছিল রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে। এছাড়া নব্বই দশকের শেষভাগে রচিত প্রভাংশু ত্রিপুরার ঐতিহাসিক নাটক 'ত্রিপুরেন্দ্র' খাগড়াছড়ির বিভিন্ন মঞ্চে সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ত্রিপুরার মাণিক্য রাজেণ্যদের শৌর্য বীর্যের এ আখ্যায়িকায় ভাল ও মন্দ মানুষের দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে 'শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন' এ সত্যবাণীকে তুলে ধারা হয়েছে।

এই গেল বাংলা নাটক প্রসঙ্গ। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ধ্যে নিজস্ব ভাষায় নাটক রচনা ও অভিনয়ের প্রমাণ পাই আমরা ৭০-এর দশকে। সে সময় প্রতি বছরই পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন মাসব্যাপী কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করতো পুরাতন কোর্ট বিল্ডিং মাঠে। এ প্রদর্শনীতে ১৯৭৮ সালে প্রথম চাকমা নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির নাম 'ধেভাবৈদ্য', রচয়িতা সুগত চাকমা। এ নাটকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শক নন্দিত হয়ে ছিলেন চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়। সুগত চাকমা এর পর যে চাকমা নাটকটি রচনা করেন সেটির না 'নীল মোন স্ববন'। ১৯৮২ সালে ডা. ভগদত্ত খীসা বিখ্যাত ফরাসী নাটক মলিয়রের 'গেন্ডালিস' নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচনা করেন নাটক 'অয় নয় বৈদ্য' দর্শক নন্দিত এ তিনটি চাকমা নাটকের সুত্য ধরে বিকশিত হতে থাকে আধুনিক চাকমা নাটক।

চাকমা নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে রাঙ্গামাটির এক ঐতিহ্যবাহী সৃজনশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন জুম ঈমথেটিকস কাউন্সিল (জা-ক)। বিগত দু'দশক ধরে এ সংগঠনটি পার্বত্য চট্টগ্রামের নাট্য আন্দোলনে উলেস্নখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশেষত এক দশকেরও বেশী সময় ধরে আদিবাসী মেলার আয়োজন এবং মেলা উপলক্ষে চাকমা নাটক মঞ্চায়ন সংগঠনটির অনিবার্য কর্মসূচি হিসাবে গৃহীত হচ্ছে। জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিলকে পার্বত্য চট্টগ্রারে চাকমা আদিবাসী নাট্যচর্চার পৃথিকৃত সংগঠন বলা যায়। ১৯৮৩ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্স্ত জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিলের কর্মীরে দ্বারা রচিত ও অভিনীত নাটকের সংখ্য প্রায় ২ ডজন। এগুলো হচ্ছে চিরজ্যোতি চাকমার 'আনাত ভাজি উদে কা'মু (১৯৮৩), শান্তিময় চাকমার 'যে দিনত যে কাল (১৯৮৪) বিজু রামর স্বর্গত যানা (১৯৮৫), আন্দারত জুনি পহর (১৯৮৬) ঝরা পাতার জিংকানী (১৯৯৪) ইত্যদি। নিবেদিত প্রাণ নাট্যকর্মী ও কবি মৃত্তিকা চাকমা রচিত নাটকগুলো হচ্ছে দেবংসি আধর কালা ছাবা (১৯৮৯) গোঝেন (১৯৯০), মহেন্দ্রর মনবাঝ (১৯৯১), এক জুর মান্নেক (১৯৯২), জোগ্য (১৯৯৪) হক্কানীর ধনপানা (১৯৯৯), এগাত্তুরের তরুণী (২০০১),

ভূদ (২০০২), থবাক (২০০৫) ইত্যাদি।

এছাড়া ডা. ভগদত্ত খীসা রচিত 'অয় নয় বৈদ্য (১৯৯৩) ঝিমিত ঝিমিত চাকমা রচিত 'অধত (১৯৯৫), আন্দালত পহর (১৯৯৬), কাত্তোন (২০০০), অঈনজেব (২০০৪), আহ্জারি মুবাহ্ (২০০৮) তরম্নণ কুমার চাকমা রচিত 'দুলু কুমারী (২০০৩), সন্তোষ চাকা রচিত 'গুআ চেল্যা বাণী (২০০৬) নাটক জাক কর্তৃ রাঙ্গামাটির বিভিন্ন মঞ্চে একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়। রং ধং থিয়েটার অতি সম্প্রতি তাদের প্রথম প্রয়োজনা কাপ্তাই বাঁধের দুঃখময় পরিনতীর করম্নণ আখানের উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকা চাকমা রচিত 'বাণ' (২০০৮) রাঙ্গামাটি ও ঢাকায় মঞ্চস্থ করে। এছাড়া নাট্যকার আরফান আলী ও রনজিৎ মিত্রের বেশকটি নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়েছে।

পাবর্ত্য চট্টগ্রামের নাট্যচর্চার ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করতে গেলে চাকমাদের পরপরই ত্রিপুরাদের কথা বলতে হয়। গত শতাব্দির মধ্যভোগেও যাত্রাপালা আয়োজনের নিরীখে গোত্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাপকাঠি বিচার করা হতো। যে জনপদে যতোবেশীবা যাত্রাপালার আয়োজন হতো সে জনপদে সে বছর ভালো ফসল হয়েছে বলে মনে করা হতো। যা হোক আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর নাট্যচর্চাকে চারটি স্তরে ভাগ করতে পারি। যেমন ১। যাত্রাপালার যুগ ২। লোক গীতির যুগ ৩। প্রস্তুতি যুগ ৪। সংগঠিত যুগ বা বর্তমান যুগ।

যাত্রাপালার যুগে বাংলা নাটকের অভিনয়ই হতো। ককবরোকভাষী ত্রিপুরাদের বাংলা উচ্চারণ অস্পষ্ট ও বিকৃত হলেও দর্শকরা তা বুঝে নিতো। অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে যাত্রাপালার আয়োজন শ্লথ হয়ে পড়লেও ত্রিপুরা সমাজে পালাগান, লোকগান বা গীতাভিনয়ের যে ঐতিহ্যবাহী রীতি ছিল তার প্রসার বেড়ে গিয়েছিল বহুগুন। নাট্যগুণ সম্পন্ন এসব গীতাভিনয়ের মধ্যে জনপ্রিয় পালাটির নাম হচ্ছে 'পুন্দা-তান্নায়।'

আশির দশকের প্রথমভাগে খাগড়াছড়ি সদরের কিছু যুবক চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে নাটককরার উগ্যোগ নেয়। মূলতঃ সেই উদ্যোগকেই ত্রিপুরা নাট্যচর্চার প্রস্তুতিকাল বলা যায়। এসময় ত্রিপুরা ভাষা তথঅ ককবরোক ভাষায় যে নাটকগুলো মঞ্চস্থ হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে– 'লক্ষীয়ই নাইসংদি অংব থাংনো' (প্রিয়তমা একটু দাঁড়াও আমিও যাবো) 'দুয়ালাম' (দরোজা) 'দাফা' (যৌতুক) ইত্যাদি।

ত্রিপুরা নাট্যচর্চার সংগঠিত যুগ ধরা যায় ১৯৯৩ সালকে। এ সালে খাগড়াছড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় য়ামুক নাট্যগোষ্ঠী। য়ামুক নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ডজন খানেক ত্রিপুরা নাটক রচিত ও মঞ্চস্থ হয়। য়ামুক নাট্যগোষ্ঠীর প্রথম প্রয়োজনা হচ্ছে 'য়ামুক' (অগ্রপথিক/শুভযাত্রা)। ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরামের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৯৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। মথুর ত্রিপুরা রচিত এ নাটকের দ্বিতীয় মঞ্চায়ণ হয় ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল খাগড়াপুর সালকাতাল ক্লাব মাঠে। ১৯৯৪ সালের ১লা জুন মথুরা ত্রিপুরার দ্বিতীয় নাটক 'খুম্পৌতি' মঞ্চস্থ হয়।

১৯৯৫ সালের ৯ জানুয়ারি খাগড়াছড়ি বইমেলা মঞ্চে লিয়ন ত্রিপুরার 'অঅইক্যাং' (অভ্যাস) নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। য়ামুক নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক প্রদর্শিত লিয়ন ত্রিপুরার অন্যান্য নাটক হচ্ছে– বেনি ভগাই (পরের তরে) সুরম্নংদি (শিখুন) গাম সামুং (ভালাকাজ), ফা কতয় (সৎ পিতা) ইত্যাদি।

যাবে। তার যাত্রাপথ যেন কণ্টকময় না হয়, সে জন্য নানা আয়োজন ও ব্যবস্থা তাদের করতে হয়।

গারোদের মৃত্যু হলে মরদেহ পোড়ানো হয়। তবে তার আগে নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। কোনো বাড়িতে কেউ মারা গেলে গারো সম্প্রদায়ের লোকেরা বাদ্যযন্ত্র ও ঢোল বাজিয়ে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করে। মাতৃগোষ্ঠীর আত্মীয়দের উপস্থিতি ছাড়া মরদেহ সৎকার করা যাবে না। এ জন্য যত দ্রুত সম্ভব মৃত ব্যক্তির মাতৃকুলের নিকট আত্মীয়দের খবর দেওয়া হয় সবার আগে। মরদেহ ধৌত করার পর মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে ভালো পোশাকটি তাকে পরানো হয়। মরদেহের দু'পাশে তার পোশাক-পচ্ছদ, থালা-বাসন, ঘটি-বাটি এসব শখের জিনিসপত্র জড়ো করা হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা প্রত্যেকেই সাধ্যমত একটি করে নতুন কাপড় তাকে প্রদান করে। আত্মীয়-স্বজনরা সাধ্যমত খাদ্যসামগ্রী বিশেষ করে গরু-ছাগল, শূকর, হাঁস-মুরগি, চাল-ডাল, আনাজ-তরকারি, মসলাপাতি, মদ ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে আসে। এই দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে খাবারের আয়োজন করা হয় এবং খাদ্যগ্রহণ ও মদ পানের মধ্য দিয়ে বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে আত্মীয়-স্বজনরা মৃত ব্যক্তির স্মরণে বিলাপ করে। এরপর নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে মরদেহ চিতায় সাজানো হয়। মৃত ব্যক্তির সাথে তার শখের দ্রব্য-সামগ্রী তথা থালা-বাসন, কাপড়-চোপড় এবং আত্মীয়-স্বজনদের দেয় পোশাক-পরিচ্ছদ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সোনা-রূপা তার সাথে চিতায় দাহ করা হয়। গারোদের বিশ্বাস মৃত্যু পরবর্তী দীর্ঘ যাত্রায় মৃত ব্যক্তির এসব দ্রব্যাদির প্রয়োজন পড়বে। লাশ দাহ হয়ে গেলে হাড়গোড় উঠিয়ে একটি পাত্রে রাখা হয় এবং সেখানে নিশান উড়িয়ে দেয়া হয়। এই হাড়গোড় ও চিতার ছাই মাটিতে পুঁতে ফেলার পর সেই স্থানে একটি ছোট আকৃতির ঘর তৈরি করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে মৃত ব্যক্তির স্মরণে বছরব্যাপী নানা আনুষ্ঠানিকতা পালন করে গারোরা।

মাতৃতান্ত্রিক খাসিয়াদের মতো গারোরা মৃতদেহের সামনে পশুবলি দেয়, মদ পান করে এবং আনুষ্ঠানিক নৃত্য-গীত পরিবেশন করে। তাদের ধারণা মৃত ব্যক্তির আত্মা এতে শান্তি লাভ করে। আদিম যুগে পশুর পরিবর্তে নরবলি দেয়া হতো। চিতায় মৃতদেহ পোড়ার পর তা কুড়িয়ে একটি মাটির পাত্রে রাখা হয়। পরে তা পুড়িয়ে দাহ করে জমিতে ছড়িয়ে দেয়া হয়। গারোদের বিশ্বাস এতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এরকম প্রথা খাসিয়া, লুসাই ও চাকমাদের মাঝে প্রচলিত।

গারোদের সংস্কৃতি খুবই সমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য। বিশেষ করে তাদের লোকসাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতি। তাদের নৃত্য গীত খুবই আকর্ষণীয় ও বর্ণাঢ্য। নানা পূজা-পার্বণ এবং উৎসব ও আনন্দ-অনুষ্ঠানে নাচ গানের আয়োজন অপরিহার্য। ছেলেমেয়ে নারী-পুরুষ সকলেই মিলেমিশে আনন্দের অংশীদার হয়। বিশেষ করে তাদের নবান্ন উৎসব ওয়ানগালা, বার্ষিক পর্ব রং চু, বিয়ে ইত্যাদি।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, গারোদের কোনো নিজস্ব বর্ণমালা নেই, নিজস্ব মৌখিক গারো ভাষায় তারা যেমন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে তেমনি তারা বাংলা ভাষায়ও কথা বলতে পারে। তাদের আঞ্চলিক বাংলা ভাষা ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষারই অনুরূপ। অন্যদিকে গারোরা যদিও পুরাতন আদিম ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসবোধ এবং আচার-আচরণে এখনো অনেকটাই অনর সমাজের পরিচয় নিয়ে বাংলাদেশে বসবাস করছে, তথাপি বাংলাদেশের সমতলে বসবাসকারী প্রায় পঁচানব্বই ভাগ গারোই খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। আর খ্রিষ্ট ধর্মের শিষ্টাচারের পাশাপাশি তাদের আদিম ঐতিহ্য অনুযায়ী সাংসারেক ধর্মেরও নানা আচার-আচরণ ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করে থাকে। এই বৈপরিত্য নতুন কিছু নয়। তবে বর্তমানে

তবে আমরা এমন উদাহরণ দেখেছি আলামতের অভাবে ইতিমধ্যে অনেক আসামীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি শুধু পাহাড়ী আদিবাসীদের একটি কথাই বললাম। এটা ঠিক যে, আদিবাসী মেয়েরা শুধু পাহাড়ে নির্যাতিত নয়, সমতলেও এরা নির্যাতিত হচ্ছে। আমরা সকলেই জানি, আদিবাসী নারীরা হাসপাতাল ক্লিনিক গুলোতে, বিউটি পার্লারে, ইপিজেদ সহ কলকারখানাগুলো অফিস আদালতে প্রচুর শ্রম দিচ্ছে। তার সাথে সাথে প্রতি বছর দেশের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে লেখাপড়ার জন্য ভিড় করছে আদিবাসী মেয়েরা। কিন্তু এখানে তারা কতটুকু নিরাপদ তা প্রশ্নের বিষয়। আমাদের আদিবাসী মেয়েরা প্রকৃত পক্ষে সহজ-সরল প্রকৃতির আর অন্যকে সহজেই তারা বিশ্বাস করে এতে তাদের সরলতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণা করা হচ্ছে, করা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

পরিশেষে আদিবাসী নারীদের সচেতন, হবার আহ্বান জানাই। আর তা হতে হবে নিজের প্রয়োজনে নিজেকে রক্ষার জন্য এবং এগিয়ে যেতে, যারা শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন তাদের এগিয়ে আসতে হবে এবং অন্যকেও সে সুযোগ করে দিতে হবে। এতেই নারীদের নিরাপত্তাহীনতা কমে আসবে।

* ছাত্র

বিষু

জমিন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (জমিন)

প্রকৃতির সব রূপ রাঙিয়ে
চলে এসেছে বিষু
স্বপ্নীল লাল সবুজের পাহাড়ে
বসে আছি একাকী আমি।

সবুজের ঘেরা এই প্রকৃতি
ফুটে উঠেছে নিত্য নব রূপে,
বিষু তুমি চলে এসেছো তাই
বরণ করি তোমার আনন্দের সানাই বাজিয়ে॥

বিষু তোমার আগমনে
প্রকৃতির সব রং বদলায়
শিশু কিশোর যুবক যুবতীরা
মেতে উঠে ঐতিহ্যবাহী ঘিলা খেলায়॥

* ছাত্র-এইচ এস সি পরীক্ষার্থী, ওয়াগই পাড়া, রোয়াংছড়ি।

বৈসাবি

মাহমুদ হাসান

আমার কৈশোরিক শঙ্খ নদীর
উজানে ফেলে আসা,
সেই জুম্ম মায়ের গাঢ় আহ্বান
এখনো শুনতে পাই
দিব্যি দেখতে পাই।

আমাদের নবীন কিশোরীরা
এখনো কাঁশের ফুলকে সোনার হাঁসের পালক,
বৈসাবি এলে–
গীত গায় জুমের ঢালে।

* লেখক- ছাত্র, দর্শন বিভাগ, ঢা বি।

নববর্ষের আহ্বান

সুনীল তঞ্চঙ্গ্যা

আজকের এই সুন্দর দিনে
নেমে এল ভুবনে,
নব নব পসরা নিয়ে
এসেছে নববর্ষ সকলের তরে।

এমন সুন্দর দিনে
জেগে ওঠে মানুষের মনে,
নতুন কিছু পাবার আশায়
জীবনের নতুন ধারায়।

বৈশাখী বিকেলে জেগে ওঠে আকাশে
হাজার হাজার চন্দ্র তারা,
তারই মধ্যে খুঁজে পাই
জীবনের আলোর আশা।

* ৮ম শ্রেণীর ছাত্র, ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রতীক্ষা

শ্রীজ্ঞান তঞ্চঙ্গ্যা

বিবেক; নিস্তব্ধ নিঃসাড়
সব শ্রোতা; আজ বিস্ময়ে নির্বাক
নেই মৌলিক অধিকার।
স্বপ্নের বাড়ি, স্বপ্নের ঘুড়ি
স্বপ্ন কাজের স্বপ্নে পাড়ি,
দিতে যদি চাই
পেতে হবে আরো মানবাধিকার।

পাহাড়ে কোলে বাসা বেঁধে আছে শঙ্কা,
দিনে দিনে যদি বাড়ায় আরো কোন্দল
বিফল তবে শৃঙ্খল নিয়ে–
আমাদের বেঁচে থাকা।

সংবিধান যদি মৌলিক অধিকার নেয়,
মানবাধিকারের কোন প্রয়োগ হলো না
লাল সবুজের পতাকার নিচে কি?
আদিবাসীর অস্তিত্ব থাকবে না॥

* ছাত্র, আইন বিভাগ, ঢ.বি

আতর্নাদ

নিরময় তঞ্চঙ্গ্যা (নিলয়)

সুরম্য এই পৃথিবীর সর্বত্র আজ শুধু বিভীষিকাময় ধ্বংসযজ্ঞ
পরস্পরের উপর কর্তৃত্বের রেশ ধরে মানুষ হয়ে উঠেছে নিরতিশয় দূর্ধর্ষ

অস্তিত্বের অবশিষ্ট অংশ থেকেও তাই আজ রক্তের অনবরত নিঃসরণ
একটি শিশুর জন্ম যদি হয় এরূপ বেদনা নীল পরিবেশে
সকল হাসি তার হারিয়ে যাবে সময়ের অববাহিকায়।

পথহারা এই আমরা ক'জনা চলছি আজানার অন্ধকার রাস্তায়
ছাত্ররাজনীতির নামে চলছে এ কোন খেলা।
চাই না আর কোন ধ্বংসলীলা, আর কোন যবনিকাপাত
দূর হোক সকল অবিচার সকল ধিক্কারজনক কাজ।

* ছাত্র, এইচ এস সি পরীক্ষার্থী, নটরডেম কলেজ, ঢাকা।

পদযাত্রা

সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যা

ক্লান্ত! তবুও চলতে হয়,
নয়তো– জীবন সার্থক নয়।

সংগ্রাম, সেইতো চিরায়ত!
যেখানে জীবনের পথ অনন্ত।

নয়– পুঁজি আর প্রাচুর্য্যে
ভোগ বিলাসে মত্ত হওয়া
কোন মোহনীয় যাপন কিংবা এলিট।

জানি, সংকীর্ণ কন্টকময় এ পথ–
তবু ও থেমে থাকার নয়,
জীবন! সে তো চলবেই–
তার সমূখ অভিষ্ট লক্ষ্যেই।

* ছাত্র, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, চবি

আড্ডা

নিজাম বিশ্বাস

শহরতলীর রাস্তায় শেয়ালের রাত
শূন্য চায়ের দোকান,
আলো বিপরীতে বাতাসে ছায়া
ঝিম্ ঝিম্ সাঁই সাঁই
ধূলা হয়ে উড়ে যায় বাতাসেরা।

আত্মারা ঘুমবার পর এদিক সেদিক
ছুট-দৌড়-ঘর-ফির
শূন্য বেঞ্চিতে টেবিলের ওপর
হেলানো কাপে, ঘুমন্ত গ্রাসে
কয়েকটা প্রেতাত্মা খুঁজে ফিরে
পুরনো আড্ডা।

* ছাত্র: ঢা.বি.

WISDOM

Milan Tangchangya

Let me know the mysterious things
Have you ever been to dream?
It is I who am to
Find out all the mysteries.
I have learnt were
The book is knowledge,
If you want to learn
Go to named 'Nature' College
Knowing is my task
And is my guide line,
That would take me away
To an enlightened way fine.
How much could I know
Regarding to these things?
I know nothing actnally
Life has gone to the dogs
Without its meanings.

* Battali Phara, Rowangchari, Bandarban

তৈন্‌গাঙের বৈসাবি-২০০৯ সংখ্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জনগোষ্ঠীকে জানাই শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন
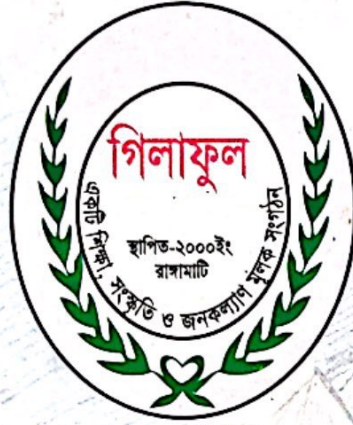
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) সম্মানিত সকল সদস্য ও সদস্যার তথা অত্র এলাকাবাসীর ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বৃত্তি পরীক্ষা/এস এস সি/এইচ এস সি পরীক্ষায় সাহায্যে সহযোগিতা করা, সর্বোপরি শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া পাশাপাশি গ্রামের জনকল্যাণ মূলক কাজ করা ।

২) যে কোন সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য পদক্ষেপ নিতে ও সকলের সহযোগিতায় তৎপর থাকতে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সেটার সমাধানে সচেষ্ট থাকা ।

৩) প্রত্যেক সদস্য/সদস্যার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মনোভাব গড়ে তোলা ।

৪) নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চা বৃদ্ধি করা এবং সংস্কৃতি কর্মী গড়ে তোলা ।

রামচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা
সভাপতি
গিলাফুল
সোনারাম কার্বারীপাড়া, রাঙ্গামাটি

পরানচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা
সাধারণ সম্পাদক
গিলাফুল
সোনারাম কার্বারীপাড়া, রাঙ্গামাটি